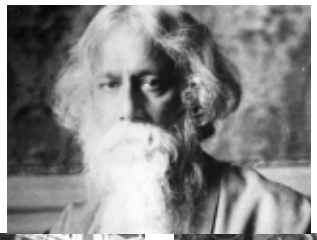

রবীন্দ্রনাথ— ঘরে-বাইরে

জহর মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সময় অভিভাবকদের এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, এখানে পড়াশুনায় কখনও গ্যাঁটের কড়ি গুনতে হয় না। ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের মতো। অদৃশ্য এক বন্ধন। চোখের আলোয় কাছ থেকে দেখে চোখের গভীরে সযত্নে লুকিয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষ মুনি-ঋষিদের আশ্রমিক জীবন যাপনের ধ্যান-ধারণায় ঋদ্ধ। সংযম এবং পঠন-পাঠনে অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতার অনুশাসনে আবর্তিত। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন এই মহতী কর্মযজ্ঞে দেশের শুভার্থীরা অথবা ধনবান ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। বিদ্যোৎসাহী মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাবে। শুধুমাত্র ত্রিপুরার রাজা, ভূমিপুত্র না হয়েও পঞ্চাশ টাকা পাঠাতেন। বাকি দু-একজনে যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু তা মরুভূমিতে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির মতন আকাশের সীমানা পার হয়ে ধরার ধূলিকণা ছোঁয়ার আগে মহাশূন্যে বিলীন। ফলে সেই চাতক যে ভাবে বারি যাচে, শিয়রে অনিশ্চয়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিন কাটাতে হয়। মাসের শেষে শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের পোশাক, চিকিৎসার খরচ, টুকিটাকি আরও কত— কে দেবে তাঁকে!

মাথার উপরে ঋণের বোঝাও কম নয়। ব্যবসা করতে নেমে গণপতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাবা মশায়ের কাছে হাত পেতে টাকা চাইতে পারবেন না। মন খারাপ হলেও কবি মুষড়ে পড়েননি। লড়াইয়ের ময়দানে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বাধার বেড়া ভেঙে এগিয়ে গিয়েছেন। রূপে রসে ভরা জীবন-পদ্মের পাঁপড়িগুলিকে অসীম আকাশের দিকে মেলে ধরার তাগিদে আরও বড় কর্মক্ষেত্রের ডাক দিয়েছেন। বন্ধু তারকনাথ পালিতের কাছে হাত পেতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়ে এক মাড়োয়ারির ঋণ পরিশোধ করে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। কিন্তু এটাও যে ঠিক, সাময়িক নিস্তার পেলেও ঋণের বেড়াজাল ছিঁড়ে বের হবার মন্ত্র জোগাবে কে?

তারকনাথ পালিতকে নিজের আয় থেকে সুদ দিতে হয় মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকারও বেশি। টাকার জন্য ছিনে জোঁকের

মতো ছক ছক করছে ঋণদাতারা। জমিদার-নন্দন বলে যারা ভাবেন জানবে না কেউ কষ্টের বার্তা, হৃদয়ের একতারাতে নিঃশব্দ এক রাগিণী। তবু এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও সংসারের পালে হাওয়া একটুও পড়ে যায়নি, শুধু মৃণালিনীর মন্ত্রবলে, কোন ম্যাজিকে যে সংসারটাকে উজান বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে-ই জানে

অভাব অনটন, পুত্রকন্যা পালন, দয়িতের সেবা, সবাইকে নিয়ে কলরবে ঠাকুরবাড়ির হৃৎপিণ্ড টগবগ ফুটতে থাকলেও কবি এবং লেখককে সমান্তরালভাবে নিজের গতিধারা অব্যাহত রাখার তাগিদে গুছিয়ে লিখে যেতে হয়। নিত্য জীবন যাপনে যেখানে যতো ধ্বনি ওঠে তাঁরই নিখুঁত মুখ দেখা যায় কবির তুলির টানে। সময় বিশেষে ক্লান্তি অবসাদ নেমে এলেও কবি নির্বিকার। বেশ কিছুক্ষণ মনের মুকুরে ডুবে থেকে একলা হওয়ার আস্বাদন উপভোগ করেন। সেই মুহূর্তে সুর ছন্দ, তুলি রং, পদ্য গদ্যের ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনির আবাহন শুনে আবার শুরু করেন। কলমের সাময়িক বিচ্ছেদও মেনে নিতে পারেন না।

ভারতী, বঙ্গদর্শন, বালক, তত্ত্ববোধিনী আরও কতো পত্রপত্রিকায় পাতার পাতা ভরিয়ে দিতে হয়। পাঠকের চাহিদা— চুম্বকের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক লোহার। তেমনি প্রকাশকের সঙ্গে লেখকেরও। একটা গান লিখে সুরলোকে বিচরণ করতে পারলে মনে হয় সেখান থেকে নিখিলের নর-নারায়ণের কাছে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু লেখার কাজে অনুলিপ্ত থাকারও যে সময় সুযোগ সর্বদা নেই। কবি লেখকের মনোবিহঙ্গ আপন মনে উড়ান দিয়ে রসদ নিয়ে ফিরে আসবে। কে আপন কে পর সেই বিষের ধোঁয়া আচ্ছন্ন করতে পারে না যাকে, সংসারে শত বাধার সামনে দিয়ে দৃপ্ত পায়ে কবিকেও বিচরণ করতে হবে। এখন রবীন্দ্রনাথের টেবিলে কয়েকখানা চিঠি। একজন ভৃত্য এসে রেখে গেছে। লিখতে লিখতে কী ভেবে হাতে একখানা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। চিঠির ভাষা তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে। কী দুঃসংবাদ। বাতাসের আগে দুঃসংবাদ ধাবিত হয় কবি জানতেন। কিন্তু খবরটা যে এত কাছ থেকে আসবে হয়তো জানতেন না। কবির হাড়-পাঁজর ধরে মোচড় দিতে শুরু করবে যে ভাষাগুলি কবি বুঝতে পারেননি।

শ্রীমান সত্যেনকে ডাক্তারি পড়াবার জন্যে বিলেতে পাঠিয়েছেন। আমেরিকায় গিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে বিলেতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি পড়তে চায়। ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে গরিব দুঃখী মানুষের চিকিৎসা করে আস্থা ভাজন হতে চায়। উদ্দেশ্য যে মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু পকেটে রেস্ত বলতে ঢু-ঢু। তাই যে কোনো উচ্চ পরিবারে বিয়ে করে স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব শুনে সতেন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাইলেন। ঠাকুর বাড়ির সোনার খাঁচায় বন্দি হলে ডানা ঝাপ্টা দেবে না, জানতে চাইলেন। মুহূর্তকাল পরে কী ভেবে বিলেতে পাঠিয়ে ছেলেটার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু হায়! নির্দিষ্ট যাত্রাপথ ভণ্ডুল করে সে এক সময় জাহাজ থেকে লন্ডনে নেমে পড়ে। টেমস নদীর তীরে ছবির মতো শহর। অগ্রগতি আর উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে মানুষের জীবনযাত্রা বদলে গেছে সেখানে। পথে ঘাটে অফিস-কাছারির দিকে শ্রমজীবী মানুষের দুর্বার স্রোত। রক্ত আর ঘাম নিংড়ে দিয়ে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছে। সকলের মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ দেখে সত্যেন তো মুগ্ধ হয়ে ভাবতে থাকে। যতদূর চোখ যায় প্রকৃতির নিমন্ত্রণের লিপিখানি মনে গেঁথে যায় নিঃশব্দে। ঘোরাঘুরি শুরু করে। শহরের রাজপথ জনপথ অট্টালিকার ঠিকানা, এখানে হৃদয় বাঁধা পড়ে যায় শিল্প-সৌন্দর্য্য আর প্রেমে। কিন্তু শহরে এসে চুপচাপ বসে না থেকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে কতো নতুন নতুন বন্ধু হলো। তারুণ্যে ফুটছে টগবগ করে। ঢিমে তালে বয়ে চলা এক জীবন যাপনের দুয়ার ভেঙে নতুন আলো এসে পড়ল সত্যেনের চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই চিকিৎসা পদ্ধতির উপরে ভরসা রাখতেন। এমনকি সেই সময়ে— ডাঃ প্রতাপ মজুদদার, ভি. এন. রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ডাক্তাররা রবীন্দ্রনাথকে সমকক্ষ মনে করতেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে কবির উচ্চতা সমীহ করতেন অনেকেই।

কবি তো শুধু কবিতায়, গানে গানে বিচরণ করেননি। বিশাল বিস্তৃত মানব-সাগর তীরে দাঁড়িয়ে নিরন্তর ঢেউ দেখেছেন। নানা অভিঘাতে আলোড়িত হয়েও শতদলের মতন উন্মোচিত করেছেন। কলকাতা তথা বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার তখন খুব হাঁক ডাক। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ওলাওঠায় অতিষ্ট মানুষ। যখন তখন হানা দিয়ে মৃত্যুদূত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে হাহাকার! বড় অসহায়!

কবি কান পেতে রয়েছেন। মানুষ যে খুব কাঁদছে, শুনে এগিয়ে এসেছেন। এর থেকে একমাত্র প্রতিকার সুচিকিৎসা। রোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেতনা। জীবনদায়ী ওষুধ প্রয়োগে যমকে একেবারে দেশান্তর করে দেওয়া। সজোরে ছক্কা মেরে বাউন্ডারি পার করে দেওয়া অভিপ্রায়। কিন্তু কবির সেই আশার কুঁড়িটির উপরে প্রকাণ্ড একটা পাথর চাপা দিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং বাবাজীবন। সত্যেন জানিয়েছে সাহেবদের দেশে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না। সবাই এখানে অপরিচিত। আপনজন বলতে নেই কেউ। পথে ঘাটে স্কুলে-কলেজে অবিরাম অচেনা মুখের মিছিল। কাজেকর্মে সদা ব্যস্ত। শুধু ভাষার ব্যবধান নয়। দু দণ্ড আলাপ, মন দেওয়া নেওয়ার খেলা করার খেলা দেখা যায় না। অহেতুক আতিথেয়তার সৌজন্য কেউ দেখায় না। বিশেষ করে জল থেকে

ডাঙায় তুলে রাখলে মাছ যেমন দমবন্ধ হয়ে ছটফট করে, এমনি অবস্থা সত্যেনেরও। ডাক্তারি পড়া অসমাপ্ত রেখে ঘরের ছেলে ফিরে আসতে চায় ঘরে। বাংলামায়ের কোলে ফিরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহে চেয়ে থাকে সত্যেন।

সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপ দেশটা আধুনিকতার পথ ধরে যাত্রা শুরু করেছে। নতুন নতুন কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে শিল্পে বাণিজ্যে জোয়ার নিয়ে এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রযুক্তি এবং কলাকৌশলে উন্নতমানের মানুষ হিসেবে নিজেদের গৌরব ঘোষণা করেছে। দেশের অভ্যন্তরে সমাজের অন্দরমহলে জীবনধারা বদলে দিয়েছে। রুচি এবং রচনায় সমগ্র বিশ্বে সৌভাগ্য সূর্যের আলো ছড়িয়েছে। সেই আলো পশ্চিম থেকে একটু হলেও ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে প্রতিফলনের জন্যে চিকিৎসাবিদ্যায় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জামাইকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেখানকার জল হাওয়া খাদ্যদ্রব্য সবই কেমন সত্যেনের অপছন্দ হচ্ছে। তাই আকুল হয়ে দেশে ফেরার জন্যে চিঠি লিখেছেন। জামাইয়ের আবদার, লাখ টাকার প্রশ্ন যার কাছে। মিছরির ছুরির মতো অন্তরে ফালা ফালা করে দিলেও বুঝতে বাকি রইল না কবিরও।

এতদিন চারাগাছে যে ভাবে জলসিঞ্চন করে এসেছেন— অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রতিমাসে খরচ-পত্তর যতো পাঠিয়েছেন সবই কি বিফলে গেল? সাধ করে বিলেতে পাঠিয়েছেন যাকে এখন সেই যে গলার ফাঁস হয়ে বসেছে। দেশে তাঁকে ফিরিয়ে আনার দায়দায়িত্ব যে তাঁর। আরও এককাড়ি টাকার ধাক্কা। কে দেবে? চোখের সামনে অন্ধকার পৃথিবী দুলে উঠতে দেখেও কবি অবিচলিত হয়ে ভাবলেন এই গন্ধমাদন হাতে নিয়ে দুঃসময়ের মেঘ ফুঁড়ে বের হয়ে আরও বড় পরিসরে নজর দিতে হবে। মেয়ে তো শুধু নয় এ যেন গচ্ছিত ধন কারও। যতো দিন যাবে সুদে আসলে ফেরত দেবার মতো।

রেণুকাও যে খুব একটা সুস্থ নয়। মাঝে মধ্যে জ্বর লেগেই আছে তার উপর ঠাণ্ডার ধাত। চলা ফেরায় অসুবিধা। বহুদূর থেকে গুপ্ত ঘাতকের মতো গুটি গুটি পায়ে যম এগিয়ে আসছে যেন। কবির বুকের ভিতরে এক টুকরো হাড়ের অপত্য স্নেহে লুকিয়ে থাকলেও ভয় ধরে গেছে। সত্যেনকে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে, তাতে মহাজনের দুয়ারে ধরনা দিতে হলেও।

১৮৯১। বছরের শুরুতে কবি জমিদারি পর্যবেক্ষণে কালিগ্রামে গেছেন। শৌখিন জমিদার নন্দন ভেবে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষেরা হামলে পড়েছে। সকলের সঙ্গে কবির খোলামেলা আলোচনা, নিজেকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কয়েক দিন পরে ২৩ জানুয়ারি পতিসর থেকে নদীপথে শাহজাদপুরে এলেন। এখানে হৃদয় আপ্লুত হয়ে রয়েছে নদীমাতৃক বাংলা মায়ের টানে। হঠাৎ খবর পেলেন কলকাতায় রেণুকার জন্ম। ১৮৯১ সাল ২৩ জানুয়ারি। নবাগত এক অতিথিকে বুকের সামনে নিয়ে মৃণালিনীর রাত্রি যাপন। এখন স্বপ্নে বিভোর কবি। মাত্র দু' বছর দু' মাস আগে অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮ প্রথম পুত্র। তারপর এক কন্যা, ঘর আলো করে এক টুকরো চন্দ্রমা। নবজাতকের আগমনের মূহূর্তে এক টুকরো মেঘ উড়ে এসেছিল কোথা থেকে দেখতে পায়নি কেউ। ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার হয়েছে নিঃসীম ঠাকুর বাড়ির আকাশে।

রেণুকার জন্মের অব্যবহিত পর থেকে টানাপোড়েনের শুরু। ১৮৯৯ সালে আগস্ট মোতিচাঁদ নাখতারের কাছে ঠাকুর কোম্পানির জন্য ৪০,০০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন কবি। টাকার পরিমাণ যে কম নয় বুঝেছিলেন। তা হলেও সেই বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে অনেকটা যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছিলেন। মহাজনের কঠিন চোখ দুটো মনের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে যেত অনেক সময়ে। সেই দুঃস্বপ্ন শিরোধার্য হলো মাত্র কিছুদিন অন্তর। মোতিচাঁদ নাখতার ঘাড় শক্ত করে কবির সামনে এসে দাঁড়ালেন। টাকা ফেরত দিতে হবে। মহাজনের হুকুম। সময় বেঁধে দিলেন পর্যন্ত। ১৫ এপ্রিল ১৯০২। দিনের আকাশে মেঘ ভেঙে বজ্রপাত।

অগত্যা সেই মধুসূদন দাদা প্রিয়নাথ সেন। কবির ছোটবেলার বন্ধু। মাত্র কিছুদিন আগে যাঁর কাছে কবি চিঠিতে লিখেছিলেন— 'আমার সমস্ত মন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের দিকে, মঙ্গলের দিকে, ঈশ্বরের দিকে। আমি আর পূর্ববৎ বন্ধুত্বচর্চার অবসর পাইনে। আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ যশ অপযশকে আমি আর লালন করতে চাইনে, আমি বহুল পরিমাণে নির্জন অবকাশ এবং মঙ্গল কর্মের বৃহৎ ক্ষেত্র চাই— এখন প্রধানত এই কর্মসূত্রেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে আমার যোগ— আমার নিজের জন্যে কাউকে আমি বিশেষ করে চাইনে।' (সূত্র রবীন্দ্র জীবন প্রবাহ, গৌরচন্দ্র সাহা)

এখানে বলা আবশ্যক প্রিয়নাথ সেন কখনও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় শান্তির নীড়ে পরিণত হোক এমন আগ্রহ দেখাননি বা শান্তিনিকেতনে প্রিয়নাথের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। সম্ভবত তিনিই এই বিদ্যালয়ের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডকে রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বাপেক্ষা অপচয় বলে মনে করতেন। তাহলেও কবির দুঃসময়ে দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতেন প্রিয়নাথ সেন। তাঁর সমুদ্র হৃদয়ের একূল ওকূল দেখা যেত না।

কবির চোখের সামনে অসুস্থ কন্যা রেণুকাও। কী এমন বয়েস হয়েছে তাঁর। সবে তো এগারোটা বছর পার হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই তার সামনে গুপ্তঘাতক, গলার ক্ষত Sore throat যক্ষায় পরিণত হয়েছে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি যন্ত্রণার্ত মুখে এমন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে কবির দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন না কবিও। এক নিরন্তর সংলাপ সেদিন দুজনে।

লেখার টেবিলে একপাশে রয়েছে অনেক চিঠি। শান্তিনিকেতন

থেকে একটা জরুরি চিঠি এসেছে। ধৈর্য ধরে পড়ার সময়ে কবির কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের জন্যে টাকার প্রয়োজন। হিসেব করে দেখা গেছে ছাত্রদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা সচল রাখতে গেলে প্রতিমাসে কম করেও পনেরো হাজার টাকা দরকার। যে কাজ একবার শুরু করেছেন— সেখান থেকে ফিরে আসা যে অসম্ভব। তিনি জানেন পথে বাধা আছে। একলা যেতে যেতে সেই পথে প্রদীপ জ্বেলে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে কেউ। আলো হয়ে জ্বলবে তাঁর সামনে। তাই থেমে যাবার বার্তা কোথাও নেই। বরং কদম কদম এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে গ্রামে গঞ্জের মানুষের ঘুম ভেঙে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে। দেশ এবং জাতি সত্তার অন্তর্নিহিত রূপটিকে চেনা সম্ভব হবে। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে দেশ বিদেশের পথ ঘাট ভেঙে শান্তিনিকেতনে ছুটে আসবে বিশ্বলোক।

একথা ভাবলেও খেয়াল ভাঙতেই কবি ফিরে এলেন বাস্তবের সামনে। লেখার টেবিলে আরও কতো চিঠি। কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর রথীর চিঠিখানা। চোখের সামনে মেলে ধরে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। এত কাছে থেকে এমন দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলো। কবির মুখের সব রক্ত শুষে নিয়ে গেল এক মুহূর্তে। প্রিয়তমা পত্নী মৃণালিনী দেবী রোগশয্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। এমনকী জীবন যুদ্ধে শেষ অস্ত্রটিও ভোঁতা হয়ে গেছে তাঁর হাতে। অগত্যা চিঠির উপরে করুণ সেই মুখখানা ভেসে উঠেছে। কবির কাছে তুলনা নেই যাঁর। লাবণ্যময়ীর লাবণ্য চয়নে কতো নামে ডেকেছেন। অন্তরের সেই উৎসবের বাতিটাকে এক ফুঁয়ে যদি নিয়তি নিভিয়ে দিয়ে যায়। কবির মনের কথা তোলপাড়। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে এবং ধারেকাছে সুচিকিৎসার বড় আকাল। অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই বললেও চলে। মৃত্যুর হিমঘরের সামনে থেকে মুমূর্ষু মানুষকে জীবনের উষ্ণতায় ফিরিয়ে আনার প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে জানত না। সেই সুযোগে দু-একজন গ্রাম্য বদ্যি জাঁকিয়ে বসলেও রথীর পক্ষে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ পাথুরে মূর্তির মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। না। পাথুরে মূর্তির চোখ দুটি কখনও সূক্ষ্ম অনুভূতিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে না। সেই কতোদিন আগে, ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর, জোড়াসাঁকোর পথ বেয়ে যেদিন বধূবেশে মৃণালিনী এলো। মাত্র ৯ বছর বয়েস। খেলার পুতুল ছেড়ে একঘর সংসারে, রক্ত-মাংসের অশুন্তি মানুষের মধ্যে, এক বৃহৎ পরিবারে। বিয়ের তিন বছর পরে মৃণালিনীর প্রথম সন্তান, বেলা। তারপর রথী, রেণুকা, মীরা সকলের শেষে শমীন্দ্রনাথ। এই পাঁচটি সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে আরও আট বছর বেঁচে ছিলেন। জীবদ্দশায় কবির গৃহবধূ বা ঘরণী হয়ে সংসার আগলে রাখেননি। ঠাকুর বাড়ির সর্বাপেক্ষা দুর্বার প্রতিভাসম্পন্ন এক সৃষ্টিকর্তার বলয়ের পাশে পাশে থেকে সহযোদ্ধার মতো বিজয় কেতন বহন করে নিয়ে দৃপ্ত চরণে এগিয়ে গিয়েছেন। কিছু তো চাননি। এমনকী শেষ নিঃশ্বাসটুকুতে যা কিছু ছিল, শূন্য করেও আবার ফিরে এসেছিলেন। কাব্যে সাহিত্যে সুরে সঙ্গীতে, বৃহৎ কর্মযজ্ঞে চলতে শুরু করেছিলেন কবির সঙ্গে সঙ্গে। অদৃশ্য বন্ধনে।

জোড়াসাঁকোতে বসেও কবির মনে হতো মৃণালিনী যতোক্ষণ সচল আছেন শান্তিনিকেতনে শিশু কিশোরদের কারও কচি পেট ক্ষিদেয় চুপসে থাকবে না। কবির অগোচরে সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় করেছেন যেটুকু, বিদ্যালয়ের পেছনে নিংড়ে দিয়েছেন আবার নতুন করে পাবেন বলে। এমনকী নিত্য কাজের মধ্যে দিয়ে খুবই সংগোপনে মৃণালিনীও সেখানে নিবিড় করে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু গোল বেঁধেছে প্রাকৃতিক নিয়মে। সব মেয়েরই যেমন হয়। মৃণালিনী আবার যে মা হতে চলেছেন, খবরটা কবির কাছে পৌঁছে গেছে বাতাসেরও আগে। কিন্তু এই সময়ে খুব সতর্কতা দরকার। সাবধানে, দিনগুনে পা-ফেলে চলা ফেরার পরিবর্তে মৃণালিনী আরও আগে আগে চলতে শুরু করেছে। সংসারে ঝক্কি ঝামেলা দায় দায়িত্বের বোঝা ওই গৃহবধূর শিরোপায়। একদিন এইভাবে হয়তো অসতর্ক কোনো মুহূর্তে নিজেই বিপদ ডেকে নিয়ে এলেন। আছাড় খেয়ে পড়ে গেছেন মৃণালিনী। আসন্ন এক শিশুর কুহকে ডুবে থেকে শরীরটাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলাফেরা করলেও আকস্মিক ভাবে আছাড় খেয়ে পড়ে গেছেন। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। ভয় এবং যন্ত্রণা নিমেষে দৌড়ে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে আছে এমনভাবে যে মৃণালিনীর বিছানা ছেড়ে উঠে বসারও ক্ষমতা নেই প্রায়।

রবীন্দ্রনাথের এক শ্যালক নগেন রয়েছে শান্তিনিকেতনে। কবির চিঠি গিয়ে পড়ল তার হাতে। চিঠি পড়ে বুঝলেন মৃণালিনীকে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। রথীও মায়ের সঙ্গে আসবে।

অসুস্থ স্ত্রী বাড়ি ফিরে এলে আর এক সমস্যা। সেবাশুশ্রূষা এবং চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রয়োজন টাকা পয়সারও। কিন্তু অর্থ-সংগ্রহে যাবেন কার কাছে। মনের কথা কাকে বলবেন আর। তাছাড়া কথায় আছে না দুঃসময়ের গন্ধ পেলে সেই কী একটা পাখির মতন আপনজনও গা ঢাকা দেয়। নিজের দুর্বলতার কথা শোনাতে আগ্রহী নন যে। করুণা ভিক্ষা করা স্বভাব বিরুদ্ধ যার। বিপদ বাধা যে সব সময়েই ভয় দেখায় এমন নয়। ভয়কে জয় করতেও উপায় বাতলে দেয়। অভাব অনটনে পড়লে মন মেজাজ ঠিক থাকে না কারও, কথাটা একশোভাগ যে সত্যি কবিও জানেন।

এতবড় একটা সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে আরও বড় বাধা তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। কবিতার নেশা। চেপে বসলে একবার টুপি ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ডেকে নিয়ে যাবে কোথায় কোনো আনন্দ

লোকে। ভুলিয়ে দেবে। ভুলিয়ে দেবে জ্বালা যন্ত্রণা। এমনকী সংসার অসাড় করে দেবে।

'শিশু ভোলানাথ' লেখার সময় সবপেয়েছির দেশটাতে কল্পনার ভেলায় চড়ে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়িয়েছেন। মনের মতন একটা কবিতা সংসারের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে যেভাবে, কেউ পারবেনা আর। কবি যে নিজের সৃষ্টির কাছে নিজেই বাঁধা পড়ে আছেন। ঘর-সংসার পরিবার পরিজন, দায়-দায়িত্বের মধ্যে থেকেও কারণে অকারণে মন পবনের নাও হাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলে তাঁর গতিরোধ করবে কে? কে আছে এমন। সেই মুহূর্তে তিনি কারও স্বামী বা পিতা নন। দয়িতার মনের গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে গেছেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের তিনি কে? জমিদার পিতা বা রাজাধিরাজ ঠাকুর্দার কেউ নন তিনি। সৃষ্টির মুহূর্তে তিনি এক সর্বহারা কবি। অসীমের সুরে সুরে বাঁধা পড়েছেন। নিজের ভাবনায় কীভাবে তলিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গিয়েছেন চেনাপথ। নিখিলের সংসারে বসে কবিতায় বাসা বাঁধতে শুরু করেছেন। মানুষের মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে যাওয়ার ডাক শুনেছেন। কলম এগিয়ে চলেছে প্রসব যন্ত্রণা উন্মোচনে।

মৃণালিনী দেবী

কবি লিখে চলেছেন। লেখক এবং পাঠক নিভৃতে একাসনে বসে পরস্পরের প্রতি চেয়ে রয়েছেন যেন। লেখার শেষে পছন্দ না হলে শবদেহ ছুঁড়ে দাও। আবার শুরু করো। অন্বেষার দৌড়, যতো দূরে যায়। শুধু চেয়ে দেখ। শেষ কোথায়? ভাল না লাগলে সুরের সেতারে আঙুল রেখে বুকের সামনে ধরে গান রচনা করো, 'দূরে কোথায় আরও দূরে।' সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়।' গানে গানে এমন নিখুঁত বাণী সাজায়ে কে দেয়?

মৃণালিনী জোড়াসাঁকোয় ফিরে গেলে ঘরে ঢুকে দেখলেন একান্ত মানুষটি নেই। শূন্য মনে হু হু করে উঠলে প্রাণপণে সামাল দিয়ে ভাবলেন, লেখক হবার বড় দায়। প্রকাশকের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের সাথে মন চেপে কথা বলতে হয়। বাড়িতে যার অসুস্থ পত্নী, আবার শমীও খুব ছোট, বলতে পারবে না। ১৮৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর সকলের শেষে এসে মায়ের অস্তাচলের আলোটুকু চোখে পড়েছিল শুধু শিশু শমীন্দ্রনাথের।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতে থাকে। রেণুকার বর সত্যেনও পরগাছার মতো শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করে ফুর ফুরে মেজাজে দিব্যি ঘুরে বেড়াতেন। মাস গেলে আবার দেড়শো টাকা। নগদ নারায়ণ মাসোহারা। তার উপর যখন তখন আবদারের বহর। এমন প্রাপ্তিযোগের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল যৌবনের উদ্যম এবং পুরুষাকার।

ঝোঁকের মাথায় বিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখনও রেণুকা কৈশোরের খোলস ভেঙে বের হতে পারেনি। মাত্র সাড়ে এগারো। কী এমন বয়েস। তা হলেও ফুলবনে তার ভ্রমর এলো। ঠাকুরবাড়ির ছকে বাঁধা জীবন। খুব ছোট বয়সে যাদের বিয়ে হয়, তাদের আবার বিয়ে হয় এবং আনুষাঙ্গিক আচার আচরণে মান্যতা দেওয়ার রেওয়াজ আছে ঠাকুর পরিবারে। দুটি হৃদয় এক করে দেওয়ার গোপন আর্জি জানানো হয় ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু সত্যেনের ব্যাপারে ঢাক পিটিয়ে মানুষজনকে দ্বিতীয়বার জানান দেওয়ার মতো বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই রবীন্দ্রনাথের। তাছাড়া অক্ষমের টাল-বাহানা উপেক্ষা করা যে অসম্ভব, কবির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুশয্যায় একান্ত অনুরোধ।

অসুস্থ কন্যার শয্যাপাশে বসে মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে কবি ঝুঁকে পড়ে মোলায়েম কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কেমন লাগছে এখন? রেণুকা নিরুত্তর। শুধু চেয়ে থাকে। এ যেন পিতা-পুত্রীর এক নিরন্তর সংলাপ। অদৃশ্য বাৎসল্যের কূল ভাঙা ঢেউ। রেণুকার যা কিছু বলার টলটলে দুটি চোখে বাধা পেয়ে ডুবে যায় গভীরে। রবীন্দ্রনাথের বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। এ বড় মর্মান্তিক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন। বাবা-মেয়ের নিঃশব্দ অন্তর্লোকের কথন। বড় একা লাগে সেই কষ্টের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। হাতের সামনে বাতাস মুঠো করে ধরতে গেলে ফিরে আসতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায়ই বাইরে থেকে ডাক আসে। বইয়ের প্রকাশক তো আছে। তার উপরে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার কাজ। 'বালক' 'সাধনা' 'তত্ত্ব বোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখে পাতার পর পাতা ভরাতে হয়। আবার বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসু। বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করে বাঙালির মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে নানারকম আপ্যায়ন, অনুষ্ঠানের উদযাপন চলেছে। সম্বর্ধনার বন্যা কলকাতা জুড়ে। সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ডাক। নৈবেদ্যের উপরে আতার টুকরো যেমন।

ঘর থেকে বের হবার মুহূর্তে অসুস্থ স্ত্রীর শয্যার দিকে পিছু ফিরে কেমন চেয়ে থাকেন। হয়তো ভাবেন, চোখে তোমায় না যদি পাই এ দেখা শেষ যেন না হয়। শরীরটা যেন শুকনো একটা গাছের ডালের মতো বিছানার এক পাশে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। নিস্তেজ হাতখানা নিজের হাতের

মুঠিতে বন্দি করে মুহূর্তের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে ডাকলেন, ভাই ছুটি। চোখ বুঁজে আছ কেন? চেয়ে দেখ, কে তোমার সামনে। মৃণালিনী তবু অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে চোখের পাতা দুটি মেলে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। যেন এমন করে দেখা হয়নি স্বপ্নের জগৎ।

রবীন্দ্রনাথ আঙুল বুলিয়ে দেখলেন মৃণালিনীর দু-চোখের পাতা কেমন ভিজে ভিজে। চোখের জলের কোনো রঙ না থাকলেও তবু ভেবে দেখলে কতো রঙে ভারী হয়ে থাকে। নিঃশব্দে, সুরে কবি গেয়ে চলেছেন 'সকরুণ সুরে বেণু বাজায়ে কে যায়।'

রথী সামনে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের মুখে প্রতিটি রক্তকণা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। বাবামশায়ের ঈশারায় সামনে এসে ধীরে ধীরে ডাকল, মা—আ-আ। মৃণালিণী নিরুত্তর। বিছানার পাশ থেকে সরে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। আসন্ন সন্ধ্যা। ঘরের জানলা খুলে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখলেন। আকাশের সিঁড়ি বেয়ে সন্ধ্যা নামছে এক-পা এক-পা করে। ময়লা করে দিচ্ছে সমগ্র চরাচর। বিছানার কাছে ইন্দিরা আর প্রমথ। কারও মুখে কথা নেই। নিঃশব্দতায় টান টান ঘরখানায় রাতাসেও নেই কোনো সাড়া। শুধু জীবন সফরে শেষ বার্তাটুকু ঝুলছে।

৭ অগ্রহায়ণ-১৩০৯ (২৩ নভেম্বর ১৯০২) ভোর হলো। সূর্যোদয় হলো। কিন্তু মৃণালিনী দেবীর জীবন-সূর্য অস্তমিত হলো চিরতরে।

রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সারারাত ছাদে একলা পায়চারি করেছেন। নিষেধ করেছেন কাউকে কাছে যেতে। আরও একলা হওয়ার দীর্ঘশ্বাস ঢেকে রেখেছেন আকাশের দিকে চেয়ে।

পরদিন খবরটা চাউর হতে সমবেদনার স্রোত। আত্মীয় স্বজনের যাতায়াত। ঠাকুরবাড়ির প্রাণপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে এসে বিবি (ইন্দিরাদেবী) সুরেন, সরলা, উর্মিলা কারও মুখে কথা নেই। নিশ্ছিদ্র এক নীরবতা বাড়িটা জুড়ে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের কথায় শোনা যাক, 'বাবা সকলের সঙ্গে শান্তভাবে, ধৈর্য্যের সঙ্গে মন ঢেলে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কি কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলাম। একমাস ধরে তিনি অহোরাত্র মা'র সেবা করেছেন। যখন সকলে চলে গেল বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা ব্যবহৃত চটি জুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।' এই দুটি কথা বলে নীরবে তার ঘরে চলে গেলেন। দুঃখ শোকে ব্যথিত মনে গৃহকোণে লুকিয়ে না থেকে কবি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন শোকগাথায়। প্রিয়তমা পত্নীর বিদায়-বেদনা কবিতার আখরে পৌঁছে দিয়েছেন অগণিত মানুষের কাছে। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরে ওই অগ্রাহায়ণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে ছয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রতীক্ষা, শেষ কথা, প্রার্থনা, আহ্বান, পরিচয় এবং মিলন। মিলনের শুরুতে কবি আবেগের সুরটিকে আলগা করে দিয়ে বলেছেন, 'মিলন সম্পূর্ণ আজি' হলো তোমা-সনে, এ বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে।' সাংসারিক চাওয়া পাওয়ার পেছনে সব মানুষেরই গোপনে কোথাও দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে। সেগুলি বহন করে এগিয়ে চলা অথবা বিদায় নেওয়া।

যশোরের দক্ষিণডিহির ফুলতলী গ্রাম থেকে ভবতারিণীর দাম্পত্য সফর শুরু করে ঠাকুরবাড়ি জল হাওয়ায় মৃণালিনীতে প্রস্ফুটিত হয়ে এক সময় জীবন-সফর শেষ। এই দীর্ঘ ঊনিশ বছরে যুগল সফরে মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে যতগুলি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রতিটি অক্ষরে ঠিক্‌রে পড়েছিল যৌথ জীবনের সংলাপ। আশ্চর্যের কথা সেই চিঠির একটি কণাও সযত্নে রক্ষা করেননি কবিও। কিন্তু মৃণালিনী আমৃত্যু সংগোপনে সঞ্চয় করেছিলেন বলে— প্রিয়তমাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ছত্রিশটি চিঠি সারা পৃথিবীর রবীন্দ্র অনুরাগীদের কাছে পৌঁচেছে। এমনকী রবীন্দ্র সম্পদে আরও ব্যাপক ভাবে সাড়া জেগেছে গবেষকদের মধ্যেও।

মৃণালিনী দেবীর জীবননাট্যের যবনিকাপাত দেখেও মন থেকে কবি মেনে নিতে পারেননি। মাত্র কিছু দিনের মধ্যে সঞ্চয় নামে কবিতা গ্রন্থে শোনা গেল স্মরণের স্বর, 'দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি/স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন-দু'চারটি/স্মৃতির খেলনাগুলি বহুযত্নভরে/গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলেন ঘরে।/ যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ভয়ে/এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে/ লুকায়ে রাখিয়াছিলে, বলেছিলে মনে/অধিকার নাই কারো আমার/ এ ধনে। আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?/ জগতে কারো নয়, তবু তারা আছে।/ তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ/ তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?'

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে কলকাতার বির্জিততলার বিলেত ফেরত দাদা বৌদির শিক্ষিত পরিবারে গ্রাম্য মেয়েটিকে মেজেঘষে আধুনিক করার মেহনতে কবির সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীও সহযোদ্ধার ভূমিকায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও মেয়ে ইন্দিরা প্রায় মৃণালিনীর সমবয়েসী ছিলেন। তাহলেও সৌন্দর্যের পিয়াসী কবি সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁর মনের অতলান্তে কতো নারীর ছায়া পড়েছে। দেশ বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে কতো মানুষের মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে যাওয়ার আহ্বান শুনেছেন। তাদের সবাইকে না হলেও মনের মতো কতো নারীকে চিঠি দিয়েছেন। স্ত্রীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পাওয়া যায় ১৮৯০ এর জানুয়ারিতে। সাজাদপুর থেকে। মৃণালিনীর জীবদ্দশায় ১৮৯০ থেকে ১৯০২, বারো বছরে ছত্রিশটি চিঠি। কবির ভাবনায় ভরা। স্মৃতিমেদুর হাওয়ায় চিঠিগুলি মৃণালিনীর কাছে যুগল যাত্রার দলিলের মতো ছিল। ■

ডাব বাবা

সিদ্ধার্থ সিংহ

তখন মধ্যদুপুর। স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা টাঙা নিয়ে নিয়েছিল শীর্ষ। যত দূর আসা যায়, এসে, দূরে আঙুল দেখিয়ে টাঙাওয়ালা বলেছিল, এই মাঠের উপর দিয়ে সোজা চলে যান, ডাব বাবার ডেরা পেয়ে যাবেন।

এই ইন্টারনেটের যুগে সারা পৃথিবীতে খবর ছড়াতে যে মাত্র কয়েক মুহূর্তই যথেষ্ট, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে বহু বছর আগেই। কোথায় কোন পাথরের গণেশ নাকি দুধ খাচ্ছে, চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে যেখানেই গণেশ বাবাজির মূর্তি, সেখানেই দুধ খাওয়ানোর জন্য মা-মাসি পিসি, ঠাকুমার সে কী লম্বা লাইন। সবাই স্নান-টান সেরে পাথরের বাটি, কাঁসার বাটি, স্টিলের বাটি, কেউ কেউ আবার কাঁচের পাত্র করেও দুধ নিয়ে এসে হাজির। যে দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু এক ফোঁটা দুধের জন্য ছটফট করে, দুধ জোটাতে না পেরে বাবা মায়েরা জঙ্গল থেকে শটি তুলে এনে, সেদ্ধ করে খাওয়ায়, সে দেশেই সেদিন যে কত লক্ষ কোটি লিটার দুধ নর্দমা দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তার কোনো হিসেব নেই। তবে জানা গিয়েছিল শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র— সে আমেরিকাই হোক, মিশরই হোক বা আলাস্কাই হোক, যেখানেই ভারতীয় সেখানেই নাকি গণেশকে দুধ খাওয়াবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এবং এখানকার

এপাড়া ওপাড়ায় রটার আগেই নাকি সারা বিশ্ব জেনে গিয়েছিল এই খবর। এবং তা জেনেছিল মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই।

তবে না। এই ডাব বাবার খবর ইন্টারনেটের মাধ্যমে নয়, শীর্ষ পেয়েছে তার বাড়ির কাজের মাসির কাছ থেকে। যেখানে ডাব বাবার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর এক ধর্মভাই নাকি সেই গ্রামেই থাকে। কী একটা দরকারে কলকাতায় এসে তাঁর বাড়িতে দু'দিন ছিল। অতদূর থেকে কলকাতায় এসেছে অথচ কালীঘাটে পূজা দেবে না, চিড়িয়াখানায় ঘুরবে না, অন্তত বাইরে থেকে একঝলক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখবে না, তা হয়?

কথায় কথায় দ্বিতীয় দিন সেই ধর্মভাই কাজের মাসিকে বলেছিলেন, এই ডাব বাবার কথা। এই ডাব বাবার নাকি অসীম ক্ষমতা। অসাধ্যসাধন করতে পারেন। যে কোনো অসুখ একদিনে সারিয়ে দিতে পারেন। মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তি করে দিতে পারেন মাত্র ক'দিনেই। যে কোনো বিপদ কাটিয়ে দিতে পারেন মুহূর্তে। মোদ্দা কথা, সব সমস্যা সমাধানের মন্ত্র আছে তাঁর কাছে।

কাজের মাসির কাছে ডাব বাবার কথা শুনে শীর্ষ জিজ্ঞেস করেছিল, 'উনি কি তান্ত্রিক?

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে নিজের নাক-কান মুলে তিনি বলেছিলেন, না না, তান্ত্রিক কী গো? উনি তো তান্ত্রিকের বাবা।

— তান্ত্রিকের বাবা! ও, ওনার ছেলে তান্ত্রিক?

— না না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, এক হাজার তান্ত্রিক অনেক সাধ্য সাধনার পরেও যা করতে পারে না, উনি তা এক নিমেষেই করে দিতে পারেন। বড় বড় তান্ত্রিকরা তো ওনার পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে গো..

— ও! উনি বুঝি খুব ছোটবেলা থেকেই সাধনা করতেন, না?

— না না। সাধনা-টাধনা নয়, উনি নাকি ওই গ্রামের একজন খুব সাধারণ মানুষ। কী যেন নাম! কী যেন নাম! ও হ্যাঁ, রাঘব। ওনার নাম রাঘব ঘড়াই। তা, আমার ধর্মভাই তো বলল, উনি নাকি আগে পাতকুয়োর কাজ করতেন। কিন্তু কুয়োর কাজ তো আর রোজ রোজ পায় না। কাজ না করলে খাবে কী? তাই কারও কোনো দামি গয়না, সে গলার হারই হোক বা নাকের নাকছাবি, পুকুর বা কুয়োয় পড়ে গেলে, এক ডুব দিয়ে উনি সেটা ঠিক তুলে নিয়ে আসতেন। এ কাজে ওনার খুব নামডাক ছিল। তাতে উনি যা পেতেন, ওনার সংসার কোনোমতে চলে যেত। সংসার আর কী বিয়ে-থা তো করেননি। তিনি আর তাঁর মা।

— সে ঠিক আছে। কিন্তু উনি ডাব বাবা হয়ে উঠলেন কী করে?

— সেটাই তো বলছি। একদিন গ্রামের এক গভীর কুয়োতে কার নাকি একটা পেতলের বালতি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল। যৌতুক হিসেবে বিয়েতে আর যা যা সে পেয়েছিল, রেডিও, সাইকেল, ঘড়ি সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধু বেঁচে ছিল ওটা। তাই ওটার জন্য তাঁর যত না আফশোস, তাঁর বউয়ের আফশোস তার দ্বিগুণ। সে তো প্রায় কেঁদেকেটে একশা— একে একে সবই গেছে। কিছুই তো আর অবশিষ্ট নেই, যে ভাবেই হোক তুমি আমাকে ওটা তুলে এনে দাও। ওটা আমার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

কিন্তু তুলে এনে দাও বললেই তো আর তুলে এনে দেওয়া যায় না। অত গভীর কুয়োয় নামবে কে? অগত্যা ডাক পড়ল সেই রাঘব ঘড়াইয়ের। যে কোনো হারানো জিনিস এক ডুব দিয়েই যিনি তুলে আনতে পারেন। তিনি ওই কুয়োতে যে দিন নামলেন, সে দিন যেন উঠতেই চান না। অনেকক্ষণ পর যখন উঠলেন, তখন ওই বালতি তো আনলেনই সঙ্গে আনলেন বালতি ভর্তি করে হিরে, জহরত, মণি-মানিক্য, সোনাদানা। যারা কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে মজা দেখছিল, তারা তো একেবারে থ। তাদের মধ্যে থেকেই কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এগুলি কোথা থেকে পেলে?

না। উনি নাকি কোনো উত্তর দেননি। বালতিটা দিয়ে, পারিশ্রমিকও নেননি। সোনাদানা, হিরে-জহরত গামছায় বেঁধে চুপচাপ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

লোকটাকে অত হিরে জহরত কুয়ো থেকে তুলতে দেখে পাড়ে দাঁড়ানো অনেকেরই চোখ চক্‌চক করে উঠেছিল। কারও কারও মনে হয়েছিল, বালতি ভরে যখন নিয়ে এসেছে, তার মানে ওখানে আরও আছে। তাই অন্য কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই গ্রামের এক মাতব্বর তারক নাকি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেয়ে ঝটপট কুয়োয় নেমে গিয়েছিল। দশ মিনিট গেল, পনেরো মিনিট গেল। আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। কিন্তু কুয়ো থেকে তাকে উঠতে না দেখে আশপাশের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। ফের খবর দেওয়া হল রাঘবকে। তিনি যখন কুয়ো থেকে তাকে তুললেন, তার সারা গায়ে সবুজ শ্যাওলা আর ঝাঁঝরি গাছে মোড়া। পেট ফুলে ঢোল। কোনো হুঁশ নেই। এ আসে, ও আসে, সে আসে। নানা

পরামর্শ দেয়। টোটকা বলে। কিন্তু কিছুতেই আর জ্ঞান ফেলে না তার। তখন রাঘবই নিজে থেকে বললেন, একটা ডাব আনো তো দেখি...

সঙ্গে সঙ্গে তারকের বড় ছেলে তরতর করে গাছে উঠে একটা ডাব পেড়ে আনল। ডাবটার মুখ কেটে দিল একজন। রাঘব সেই ডাবের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কী একটা বলে, বাঁ হাতে একটু ডাবের জল ঢেলে ডাবটা উপুড় করে বাকি জলটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর বাঁ হাতের সেই জল তারকের মুখে ছিঁটিয়ে দিতেই কয়েক পলকের মধ্যে সে চোখ মেলে তাকাল। আস্তে আস্তে বলল, আমি কোথায়? এতো লোক ভিড় করে আমাকে দেখছে কেন? কী হয়েছে আমার?

সেসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ছোট্ট একটা ডাব দিয়ে যে মরণাপন্ন লোকের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে, সে তো যে সে লোক নয়। তাঁর বিশাল ক্ষমতা।

অনেক সাধুবাবা দেখেছি জীবনে, কিন্তু এরকম ডাব বাবা এই প্রথম দেখলাম। কথাটা কে যেন বলেছিল কে জানে, তারপর থেকেই রাঘবকে সবাই ডাব বাবা বলে ডাকতে শুরু করল। শুধু ডাব নয়, ডাবের সঙ্গে কুয়োরও একটা সম্পর্ক আছে, তাই মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়া থেকে ফিরে আসা তারক আর তার ছেলের উদ্যোগেই চাঁদা তুলে কুয়োর পাশে দরমা টরমা দিয়ে একটা চালাঘরও বানিয়ে দিল গ্রামের লোকেরা। উনি এখন সেখানেই থাকেন। কারও কোনো সমস্যা হলেই একটা ডাব নিয়ে চলে আসে তাঁর কাছে। তিনি সেই একই ভাবে মন্ত্র পড়ে বাঁ হাতে একটু ডাবের জল নিয়ে বাকি জলটা উপুড় করে ঢেলে দেন কুয়োয়, তারপর ছিঁটিয়ে দেন তার মুখে, ব্যাস!

শুধু এ গ্রামেই নয়, আশপাশের সব গ্রামে তো বটেই, বহু দূরে দূরেও ছড়িয়ে পড়ল এখবর। প্রথম প্রথম শনি মঙ্গলবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় উনি বসতেন। এখন প্রত্যেক দিন এত ভিড় হচ্ছে যে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। রোজই বসতে হচ্ছে। নিজের জন্য আর সময় পাচ্ছেন না তিনি। তাই সকাল আর সন্ধ্যায় টাইম বেঁধে দিয়েছেন। এত ডাব লাগছে যে এলাকায় আর কোনো গাছে ডাব নেই। মুচি হতে না হতেই ডাব বাবার কাছে চলে আসছে। আমদানি করতে হচ্ছে বাইরে থেকে। সেগুলোরও দাম আকাশছোঁয়া।

লোকেরা বলছে, এমনি রোগ তো কোন ছার, ডাক্তার-কবিরাজ ফেল পড়ে গেছে, সে রোগও ভাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দেওয়া মৃত্যুপথযাত্রীও এখানকার মন্ত্রপূত ডাবের জলের ছিঁটে নেওয়ার পরই ব্লাড টেস্ট, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এমনকী বায়োপসি করেও দেখেছে, ক'দিন আগে টেস্ট করা রিপোর্টের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সব কিছুই নাকি ঠিকঠাক আছে। পুরো সুস্থ। নতুন রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররাও থ। অনেকেই বলছে, এখানে যখন কোনো চাকরিপ্রার্থীর মুখে ডাব বাবা ডাবের জল ছিঁটিয়ে দেন, তখন নাকি কোনাও না কোনো কোম্পানিতে তার নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লেখা হতে থাকে। কেউ কেউ বলে, এখানকার ডাবের জলের ছিঁটেয় নাকি ভাঙা সংসার শুধু জোড়াই লাগে না, সুখে শান্তিতে ভরে ওঠে।

কাজের মাসি এসব গল্প করলেও শীর্ষর যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আজকের দিনে আবার এরকম হয় নাকি! তাই ডাব বাবার কেরামতি দেখার জন্য সে উস্‌খুস করতে লাগল। কীভাবে ডাব বাবার কাছে যাওয়া যায়। কাজের মাসির কাছে বলতেই, তাঁর ধর্মভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই গ্রামে যাওয়া এবং থাকার সব ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। সেই সুবাদেই তার এখানে আসা।

ফাঁকা ধু-ধু মাঠ। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে। তালগাছের শুকনো পাতা একটার সঙ্গে একটার ঘষা লেগে খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। উড়তে উড়তে ডাক দিয়ে যাচ্ছে এক আধটা নাম না জানা পাখি। আলপথের দু-ধারের সদ্য ধান কাটা মাঠে ঘুঘুপাখিরা কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ক'হাত দূর দূর এপাশে ওপাশে ছোট ছোট ডোবা। হঠাৎই এপাশ থেকে আলপথের ওপাশে এঁকেবেঁকে চলে গেল মস্ত একটা দাঁড়াশ সাপ।

কতটা এসেছে সে, খেয়াল নেই। দূর থেকেই চোখে পড়ল ডাবের পাহাড়। এখানে এত ডাব আসবে কোত্থেকে। না। ওগুলো নিশ্চয়ই ডাব নয়। ডাবের খোসা। তার মানে সে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে। হ্যাঁ, ওই তো সেই চালাঘর। যে চালাঘরের কথা সে তার কাজের মাসির কাছে শুনেছিল। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দেখে, চালাঘরের দরজা হাট করে খোলা। ও সেখানে উঁকি মেরে দেখে, ভিতরে একটা চৌকির ওপরে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। ওর বুঝতে অসুবিধা হল না, এই-ই সেই ডাব বাবা। ও মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ভেতরে আসব বাবা?

— কে?

— আমি।

— আমি কে?

— শীর্ষ।

— শীর্ষ কী?

— চক্রবর্তী।

— কী চাই?

— আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

— আমি এসময় কারও সঙ্গে কথা বলি না। এখন আমার বিশ্রামের সময়। সন্ধের পর কিংবা কাল সকালে এসো।

— আমি বহু দূর থেকে এসেছি বাবা।

— তো? আমি কী করব?

— রোদের মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি বাবা, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল পাওয়া যাবে?

— জল? জল তো আমি খাই না।

— তাহলে কী খান?

— ডাবের জল।

— তাই দিন।

— ঠিক আছে, দাঁড়া। বলেই, খাটের ও দিকে একটু ঝুঁকে নীচ থেকে একটা ডাব বার করে আনলেন তিনি। মুখটা কাটা। চামচের পেছনের দিকটা গায়ের জোরে গেঁথে দিয়ে এক পাক ঘোরাতেই খানিকটা চলটা উঠে এল। তারপর ডাবটা শীর্ষর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। শীর্ষ বলল, দিলেনই যখন, একটু মন্ত্র পড়ে দিন না।

— মন্ত্র? ও বুঝেছি। তুইও নিশ্চয়ই কোনো মনোবাঞ্ছা নিয়ে এসেছিস, না?

— আপনার কাছে কী আর লুকবো বাবা? আপনি তো অন্তর্যামী।

— আমি কেউ নই রে, আমি কেউ নই। সব তেনারা...

তেনারা! বড় খটকা লাগল শীর্ষর। তেনারা আবার কী? লোকেরা তো বললে বলে, আমি কেউ নই রে, সব তিনি। তিনি মানে ঈশ্বর। দেবতা। ভগবান। আর ভূত পেত্নির গল্প পড়তে পড়তে ও যতটা জেনেছে, তাতে তো তেনারা মানে— ভূত। তবে কি ওনার যা ক্ষমতা, তার মূলে রয়েছে ভূত। সবটাই ভৌতিক।

মাথার মধ্যে হাজার রকম প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল শীর্ষর। কী জট, ডাব বাবা জানেন না। তিনি বললেন, আশা করে যখন এসেছিস, চল বেটা, চল। তোর মুখে যখন ডাবের জল ছেঁটাব, তুই যা চাস, সেটা মনে মনে চাইবি, কেমন? তা হলেই হবে, চল বেটা, চল।

ঘর থেকে বেরিয়েই ডান হাতে কুয়ো। বুক অবধি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বললেন ডাব বাবা। তারপর কাত করে বাঁ হাতের তালুতে একটুখানি ডাবের জল নিয়ে, বাকি জলটা উপুড় করে ফেলে দিলেন কুয়োয়। খালি খোলটা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে জমে থাকা খোলাগুলির দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। তার পর শীর্ষর মুখে জলের ছিঁটে দিতেই শীর্ষ মনে মনে বলল, কুয়োয় নামার পরে এমন কী ঘটেছিল যে একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ডাব বাবা হয়ে উঠলেন, সেটা আমার এক্ষুনি জানতে ইচ্ছে করছে বাবা।

ডাব বাবা ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, আয়। ভিতরে আয়। বলে, নড়বড়ে একটা টুল এগিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, বস। ও তাতে বসল। উনি উঠে গেলেন চৌকির উপর। আসনপিঁড়ি করে বসে, দুমিনিট চোখ বন্ধ করে বললেন, এতই যখন জানার ইচ্ছে, তা হলে শোন— সেদিন কুয়োর দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে রেখে নামছি। বুঝতে পারিনি, নীচের দিকের দেওয়ালে এত শ্যাওলা ছিল। হঠাৎ পা হড়কে পড়ে গেলাম নীচে। ছপাৎ করে উঠল জল। কোমরে খুব জোর লাগল। বুঝতে পারলাম, এই কুয়োর জল তলানিতে এসে ঠেকেছে। দাঁড়িয়ে দেখি, হাঁটুর নীচে জল। মাথার উপরে তখন ঢি ঢি করে ডানা ঝাপটাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক চামচিকে। এতেই অন্ধকার, যেটুকু আলোর রেশ আসছিল, সেটুকুও ওদের ডানায় ঢেকে গেল। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যখন ওই লোকটার পেতলের বালতিটা খুঁজছি, কে যেন নাকি সুরে বলে উঠল, বালতি নিচ্ছ নাও। জল কিন্তু এক ফোঁটাও নিও না।

আমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি না। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কেউ বুঝি মশকরা করছে। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, এখানে এই কুয়োর মধ্যে মশকরা করতে আসবে কে? তাই বললাম, কুয়ো থেকে লোকে জল নেবে না তো কি মণিমানিক্য নেবে?

ফের সেই গলা, নাকি সুরে বলল, কেন? নিলে অপরাধ কোথায়? মণি মানিক্য যা চাও দিতে পারি, কিন্তু বাপু, এক ফোঁটাও জল দিতে পারব না। আমাদের এখানে এইটুকুনিই আছে।

— তার মানে, তোমাদের এখানেও জলের অভাব?

— অভাব মানে? মহাঅভাব। কেউ যদি আমাদের এক কাপ করেও রোজ জল দেয়, তাহলে তাকে আমরা সোনাদানা দিয়ে মুড়ে রাখতে পারি।

— সোনা দিয়ে? চমকে উঠলাম আমি। হঠাৎ আর একটি গলা পাশ দিয়ে বলে উঠল, শুধু সোনা কেন? সোনাদানা হিরে জহরত মণি মানিক্য যা চাইবে, তাই দিতে পারি। আমাদের শুধু একটু জলের ব্যবস্থা করে দাও। জলের জন্য আমাদের বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। গলা

শুকিয়ে যাচ্ছে। জিভ কাঠ। জানি না, কদিন পরে কী হবে...

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আর একটি গলা ভেসে এল— সে একবার খেয়েছিলাম বটে, ডাবের জল। আমার মাসতুতো বোনপো থাকত ডাব গাছের মাথায়। আমাদের এখানে বেড়াতে আসার সময় কটা ডাব নিয়ে এসেছিল। আহা, কী তার স্বাদ! কী তার গন্ধ! এখনও যেন জিভে লেগে আছে।

— ডাবের জল! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। যেভাবে গ্রামেগঞ্জেও পলিউশন ছড়িয়েছে, তাতে ওটাই এখন একমাত্র পরিশুদ্ধ জল।

— না, না, না। সে আগে ছিল। আজ থেকে কয়েক দশক আগেও ছিল। কিন্তু তোমাদের মোবাইল আর ইন্টারনেটের ঠেলায় সেটাও গেছে। আগের মতো সবুজ গা-ওয়ালা ডাব কি আর একটাও দেখতে পাও? দেখবে, মাথা কুটলেও পাবে না। সব ক'টার গায়েই কেমন জ্বলে যাওয়া পোড়া পোড়া দাগ।

— হ্যাঁ, তাই তো?

— তবু, ওটা মন্দের ভাল। ওই জল যদি দিতে পারে, তাহলে তুমি যা চাইবে, সব দেবো, সব।

আমি বললাম, সব নিয়ে আমি কী করব? আমার তো ছেলেপুলে নেই। সংসার বলতে আমি আর আমার মা। দুজনের জন্য আর কত কী লাগে? কথা শেষ হল না। আবার সেই নাকি সুরে কথা ভেসে এল, কেন? তোমার গাঁয়ের লোকেরা বুঝি তোমার আপনজন নয়? প্রিয় লোক নয়?

আমি বললাম, কিন্তু তাদের জন্য আমি কী করতে পারি?

— যাঁরা রোগে ভোগে তাদের রোগ দূর করতে পারো। যাদের অভাব অনটন আছে, তাদের অভাব মেটাতে পারো। যারা দুঃখী, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারো....

আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল ওরা। আমি বললাম, কীভাবে?

তখন ওদের মধ্যে থেকেই একজন বলল, একটা কাজ করো, যারা তোমার কাছে সমস্যা নিয়ে আসবে, তুমি তাদের একটা করে ডাব আনতে বলবে। সেই ডাবের মুখ কেটে তার কাছে মুখ নিয়ে তুমি শুধু একটা মন্ত্রই উচ্চারণ করবে— হে ভূতরাজ, এ যা

চায়, সেটা যেন পায়। বলেই ডাবের জলটা বাঁ হাতের তালুতে দু-তিন ফোঁটা ঢেলে নিয়ে বাকি জলটা আমাদের কুয়োর ওপরে উপুড় করে ঢেলে দেবে। তার পর বাঁ হাতের জলটা তার মুখে ছিঁটিয়ে দেবে, ব্যাস। তা হলে তুমিও তোমার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের সেবা করতে পারবে, আর আমরাও ডাবের জল পেয়ে তৃপ্ত হব। বলেই উধাও হয়ে গেল ওরা। বালতি তুলতে গিয়ে দেখি, সোনাদানা, হিরে জহরতে ভর্তি। ওরা ভালবেসে দিয়েছে, আমি তো ফেলে দিতে পারি না। তাই নিয়ে এলাম। আসার সময় ওদের কাউকে দেখতে পেলাম না। তবু ওদের শুনিয়েই চিৎকার করে বলে এলাম, যা দিয়েছ, দিয়েছ। আমাকে আর কখনও এসব দিয়ো না। তোমরা যে মন্ত্র আজকে আমাকে দিলে, তা যদি সত্যিই কাজ করে তাহলে গোটা পৃথিবীর সব ধনরত্ন এক জায়গায় জড়ো করলেও তার কাছে নস্যি হয়ে যাবে...

— সেই হিরে জহরতগুলি কোথায়?

— ওগুলো দিয়ে আমি কী করব। তাছাড়া ওগুলো বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। কখন চোর আসে, ডাকাত আসে। দুদণ্ডের জন্যও নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তাই পরদিন খুব ভোরে কাকপক্ষী ওঠার আগেই আমি ওগুলি সেই কুয়োতেই ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। যাতে কেউ টের না পায়। পেলেই গণ্ডগোল। ফেলার পরে সে কী শান্তি!

— তারপর?

— তার আবার পর কী? ওইভাবেই চলছে।

— আর কতদিন চলবে?

মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে ডাব বাবা বললেন, আর একদিনও নয়। আজই সব শেষ হয়ে গেল।

— সব শেষ হয়ে গেল মানে?

— ওরা বলেছিল, এই ঘটনা যেন আমি কাউকে না বলি। বললেই নাকি আমার এই মন্ত্রগুণ সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

— তাহলে বললেন কেন?

— কোনো উপায় ছিল না।

— মানে?

— ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমি যখন ডাবের কাটা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলব, হে ভূতরাজ, এ যা চায় সেটা যেন পায়। তারপর ডাবের জল কুয়োয় ঢেলেই যার মুখের উপরে বাঁ হাতে রাখা ডাবের জলটা ছিটিয়ে দেব, সে তখন মনে মনে যাই চাইবে তাই পাবে। এমনকী আমার মৃত্যু কামনা করলে, আমার মৃত্যুই হবে। আর তুমি তো জানতে চেয়েছিলে, কুয়োয় নামার পর এমন কী হয়েছিল যে একজন অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষ রাঘব থেকে ডাব বাবা হয়ে উঠলেন। তাই না? ফলে বলতে বাধ্য হলাম।

— তা হলে এখন কী হবে?

— ও কুয়োয় শুধু ডাবের জল কেন? ঝরনার জল, তালশাঁসের জল, মিছরির জল, এমনকী ঘড়া ঘড়া লস্যি ঢাললেও আর কোনোদিন কোনা কাজ হবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না। তোমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার যাবতীয় কেরামতি নষ্ট হয়ে গেছে।

কথাগুলি বলার সময় ছলছল করে উঠল ডাব বাবার চোখ। এরকম হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি শীর্ষ। একদম বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল সে। মনে মনে বলল, 'এ কী করলাম আমি। এ কী করলাম! ■

With Best Compliments From :

A
Well Wisher

রাজভাগ্য

বিরাজ নারায়ণ রায়

ভরা বর্ষা। শিঙিমারী নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে গেছে। নদীর গুরুগম্ভীর ডাক শোনা যায় বহুদূর পর্যন্ত। একটু আগেই বৃষ্টি থেমেছে। দমকা হাওয়া দিচ্ছে মাঝেমাঝেই। বেলা প্রায় পড়ে এসেছে, মেঘের আড়ালে বোঝা দায়। গ্রামের দুই মধ্যবয়সী হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছে। একজনের নাম রঙিয়া, অন্যজন খোসাল। দুজনেরই পরনে কেবল একখানি গামছা। বৃষ্টিতে ভিজে লেপ্টে গেছে সেই গামছা। মাঝ ধরতে ধরতে নানা গল্প করছে তারা। মাছ ধরার চেয়ে গল্পটাই যেন আসল।

রঙিয়া— নদীর পাড়ে এলেই আমার বুকে কেমন ধুকপুকুনি শুরু হয়।

খোসাল— কেন, কোনোদিন ভয়টয় পেয়েছিলি নাকি? সন্ধের পর খবরদার এদিকে আসিস না। আজকাল যে এতো লোক মরছে তাদের সবাই কি স্বর্গে যাচ্ছে নাকি? ভূত হয়ে এই নদীর পাড়েই থাকছে। আর মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে।

রঙিয়া— আরে না, না। ভূত পেত্নীর অমন ক্ষমতা নেই যে আমার কাছে ঘেঁসে। গত বছর সেই যে গৌড়ের সেপাইরা নদী পার হয়ে গেল পূবের কোন রাজ্যে, ভয়টা তখন থেকে।

খোসাল মাছ ধরা বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গোল গোল চোখে রঙিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল— তোকে কিছু করেছিল নাকি! আমি তো শুনেছি ওরা রাস্তায় কোনো মানুষ পেলে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তাদের দিয়ে মালপত্তর বওয়ায়।

রঙিয়া— তা আর বলতে! আমি সেদিন জোর বেঁচে গেছি। দুপুরে ঘাটে এসেছিলাম মোষগুলোকে স্নান করাতে। এমন সময় ঘোড়ায় চেপে একদল লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। সে কী দেখতে রে, ডাকাতকেও হার মানায়। হাতে এই বড় বড় বল্লম। মোষ ফেলে আমি দিলাম ছুট। দুজন সেপাই আমার পিছু নিল। কিন্তু আমার সঙ্গে কী আর দৌড়ে পারে! আমি একছুটে বাড়ি। সেই থেকে নদীপাড়ে এলেই আমার বুকে ধুকপুকুনি শুরু হয়।

এমন সময় দূরে হরিধ্বনি শোনা গেল। একদল লোক শব নিয়ে শ্মশানের দিকে আসছে।

খোসাল— ওই দেখ আজও আবার কেউ মরলো। একটা ভূতের সংখ্যা বাড়লো।

দুই।।

অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে টিমটিম করে একটা মাটির লম্ফ জ্বলছে। তাতে অন্ধকার দূর হয়নি বরং পরিবেশটা আরও ছমছমে করে তুলেছে। মাটির মেঝেতে মায়ের গা ঘেঁসে বসে আছে কান্তনাথ। শ্মশানেই তাকে সাদা থান পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবার মুখাগ্নি করেছে সে।

কান্তনাথ দুবার ডাকলো— মা, ও মা।

মা কোনো সাড়া দিল না। খুঁটিতে যেমন হেলান দিয়ে ছিল তেমনি থাকলো। চোখ দিয়ে কেবল দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

প্রতিবেশীরা বেশিরভাগই যে যার বাড়ি চলে গেল। কেবল কয়েকজন মহিলা এখনও দাওয়ায় বসে। বাইরে তাদেরই গুঞ্জন।

— বেচারির কী পোড়া কপাল রে। এই বয়সে বিধবা হল।

— সংসারে আগে পিছে কেউ থাকলে সে এক কথা। বাপের বাড়ি থেকেও তো কেউ এলো না।

— এখনও খবরই যায়নি। তো আসবে কী করে!

— ছেলেটাকে দেখে বড় মায়া লাগে গো। ওইটুকু বাচ্চা বাপহারা হলো।

— মানুষটা কত মানত, কত ওঝা-বদ্যি করে ছেলের মুখ দেখলো। সেই সুখ সইলো না।

আলো নিয়ে কেউ এবাড়ির দিকেই আসছে। মহিলাদের গুঞ্জন থেমে গেল।

একহাতে লম্ফ আর একহাতে একটি ঘটি নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন পণ্ডিত দ্বিজপদ। মহিলারা সম্ভ্রমে মাথায় ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালো।

দ্বিজপদ ঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে হাঁক দিলেন— আয় কান্ত আয়, দুধটুকু খেয়ে নে। আজ রাত্তিরটুকু না কাটলে তোদের বাড়িতে যে উনুন জ্বলবে না।

কান্তনাথ ধীর পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দ্বিজপদ দুধের ঘটি এগিয়ে দিলেন।

তারপর গলার স্বর একটু উঁচু করে বললেন— বউমা, তুমিও খেয়ে নিও।

পণ্ডিতের বসার জন্য ততক্ষণে কেউ দাওয়ায় একটি চাটাই বিছিয়ে দিয়েছে।

দ্বিজপদ বললেন— আমি আর বসছি না। আজ রাতে তোমাদের কেউ এবাড়িতে থেকো। মা-ছেলেতে একলা থাকা ঠিক হবে না।

দ্বিজপদ চলে গেলেন।

অন্ধকারে মহিলাদের মধ্যে পুনরায় শুরু হল গুঞ্জন।

তিন।।

গ্রামের শেষে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে একটা জটলা তৈরি হয়েছে। ছেলে-বুড়ো মহিলা কেউ বাদ নেই। নেহাত যারা গ্রামের বাইরে কাজে গেছে তারা এরকম একটা ঘটনা দেখতে পেল না। কেউ কল্পনাও করেনি জামবাড়ি গ্রামের কারও এরকম সাহস আছে। ছেলেটার বয়স বেশি নয়, সবে ষোলো। সে কিনা এরকম বাঘকে জালে বন্দি করলো!

এখন সেই বন্দি বাঘটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে জটলা। সামনে যারা দাঁড়িয়েছে তারা দৃশ্যটা ভালো দেখতে পাচ্ছে। পেছনের লোকেরা কেউ একটু উঁচু হয়ে, কেউ অন্যের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

— কোন বীরপুরুষ করলো হে এই কাজ?

— আমাদের কান্তনাথ।

— হ্যাঁ।

— সাহস আছে ছেলেটার।

একজন ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো। জালে বন্দি বাঘ সে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরল।

— বাঘটা কত বড় হবে হে?

— তা লম্বায় আট হাত।

— আর ওজন?

— একটা হাতির চেয়ে কম হবে না।

সময় যাচ্ছে, জটলা ক্রমশ বড় হচ্ছে। ভিড়ে ঢুকতে না পেরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বাইরে ছোটাছুটি করছে। কোনো ফাঁক দিয়ে একটু যদি দেখা যায়। তাদেরই একজন চেষ্টা করছে ভিড়ের মাঝে রাস্তা করার। কিন্তু কোনো দিকেই কিছু করতে পারছে না। আর কমবয়সি কয়েকটি ছেলেছোকরা উঠে বসেছে একটি উঁচু গাছের ডালে। এমন সময় মংলুর মাথায় পেছন থেকে কেউ একটা চাঁটি মেরে বলল— আরে, মাথাটা একটু সরা। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না।

মংলু একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছিল। চাঁটি খেয়েও সে সরল না।

এদিকে পেছনে ব্যাঘ্র দর্শনে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে ইতিমধ্যে একটা ক্ষোভ তৈরি হতে শুরু করেছে। যাদের দেখা হয়ে গেছে তাদের এবার সরে যাওয়া উচিত। বাকিরাও তো দেখবে।

কিন্তু কে কার কথা ভাবে। এমন দৃশ্য কেউ কোনোদিন দেখেনি। আর কোনোদিন দেখাও যাবে না। তাই জায়গা ছাড়তে কেউ রাজি নয়।

পেছনের ভিড় এবার ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে। চাপ পড়ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের উপর। কিন্তু সামনে তো আর এগোনোর উপায় নেই। জালের ভেতর ওরকম প্রকাণ্ড একটা বাঘ। যে কোনো সময় জাল ছিঁড়ে হামলে পড়তে পারে। তাই একটা দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা জোর ধাক্কা এলো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো সবাই। একজনের গায়ে আরেকজন। ধাক্কা সামলাতে না পেরে মংলু গিয়ে পড়লো একেবারে বাঘের সামনে।

বাঘ এতক্ষণ শান্তই ছিল। এবার গর্জে উঠলো। সে কী হুংকার। গোটা জঙ্গল কেঁপে উঠলো। ভেঙে গেল জটলা। যে যেদিকে পারল দিলো ছুট। চারিদিকে কোলাহল। মংলুর তো প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। কেউ একজন তাকে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে এলো ভিড়ের মধ্যে থেকে। তারপর চোখে

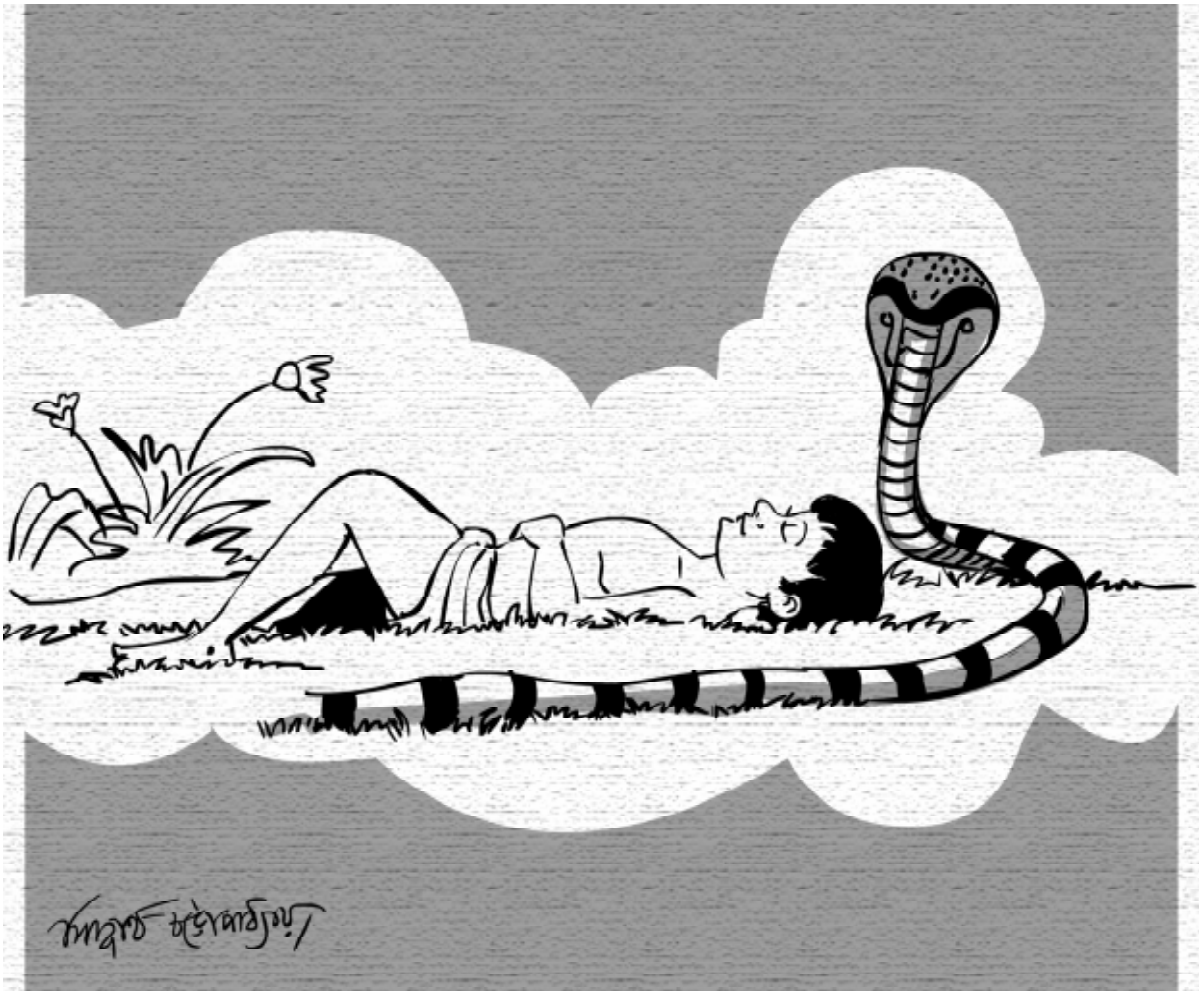

মুখে জল দিতে একটু পরে তার হুঁশ ফিরল।

চোখ খুলে বলল— বাঘটা কী আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল?

চার।।

বাঘকে ঘিরে এতক্ষণ যে জটলা ছিল তা ভেঙে গেছে। এবার ভিড় বাড়ছে তাকে ঘিরে যে এই বাঘকে বন্দি করেছে।

কান্তনাথ একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছে। সঙ্গে তার সাঙ্গপাঙ্গরা। দ্বিজপদ-সহ গ্রামের বয়স্করাও আছেন। চিন্তা হচ্ছে এই বাঘকে নিয়ে এখন কী করা যায়? জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। কারণ, বাঘের জাল খুলে দিতে যাওয়া মানে বাঘের পেটে যাওয়া। পিটিয়ে মারাও অত সোজা নয়।

গ্রামে এরকম কাণ্ড আগে কখনো হয়নি। তাই ব্যাপারটি বেশ চিন্তার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়স্করা তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু বাকি মানুষরা বেশ আমোদে আছে। তারা মশগুল কান্তনাথের বীরত্বের গল্প-গুজবে। সবার কাছে কান্তনাথের মহিমা এক লহমায় যেন অনেক বেড়ে গেছে। তাদের নানাজনের মুখে কান্তনাথের নানা কীর্তির কাহিনি। উৎসাহী মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনছে সেই কাহিনি। এই কাহিনিকারদের দলে আছে আমাদের পূর্ব পরিচিত রঙিয়া।

নানা অঙ্গভঙ্গি করে রঙিয়া বলছে— এই তো দু-মাস আগে জঙ্গলে আমার এক গোরু হারিয়ে গেল। কান্তকে বললাম, চল দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। দুজনে গেলাম ওই পুবের শাল জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকতেই একটা পাঁচ মাথাওয়ালা সাপ আমাদের সামনে ফণা তুলে দাঁড়াল। আমি এক লাফে পাঁচ হাত পিছিয়ে গেলাম। কান্ত কিন্তু নড়ল না।

— ও কী করলো! সমস্বরে বলল জনতা।

রঙিয়া অঙ্গভঙ্গি করে দেখিয়ে বলল— কান্ত নিমেষের মধ্যে সাপটির ল্যাজ ধরে ঘোরাতে লাগলো।

— তা সাপটা কত বড় হবে?

— সে তো বারো-পনেরো হাতের কম নয়।

— এ ছেলের বাঘ-ভালুকে মরণ নেই তো সাপ কী করবে হে!

রঙিয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হলো না। কাঁদতে কাঁদতে হাজির হলো বিশ্ব কবরেজের বউ। ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে সে। উৎসুক জনতা এবার রঙিয়াকে ছেড়ে ঘিরে ধরলো বিশু কবরেজের বউকে।

জালে আটকা বাঘটি নাকি কবরেজের বউয়ের আদরের ছাগলটিকে শিকার করার মতলব করছিল। আর কান্তনাথ ঠিক সেই সময়ই বাঘটিকে পাকড়াও করে। কিন্তু তারপর থেকে ছাগলটির কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

কবরেজের বউ খবরটি শোনামাত্র উতলা হয়ে দৌড়ে এসেছে।

দায়হীন জনতা পেল আরও একটি

রসদ। ছাগলটির কী হতে পারে?— এই নিয়ে শুরু হলো আরও একটি আলোচনা।

পাঁচ।।

নদীর স্নানঘাট থেকে একটি মেঠো পথ গ্রামের দিকে এসেছে। কান্তনাথ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সেই পথ ধরে বাড়ি ফিরছে। দুপুর থেকে সবাই খুব উদ্বিগ্ন ছিল। এখন সবার চোখে মুখে স্বস্তির ছাপ। বন্ধুদের মধ্যে শশী, গঙ্গা ও কান্ত সবচেয়ে বেশি দুঃসাহসী। এই তিনজনের ঘনিষ্ঠতাও বেশি। সারাদিনের ঘটনা নিয়ে তারা কথা বলছিল।

শশী— পণ্ডিত ঠাকুর যদি বিধান না দিতেন আমি ওই বাঘকে পিটিয়েই মেরে ফেলতাম।

গঙ্গা— তবে উনি ঠিকই করেছেন। জালসুদ্ধ নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ায় আর কোনো ভয় থাকল না। এমনিতেই গ্রামে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

শশী— কান্ত, বাঘটা কি সত্যি সত্যি কবরেজের বউয়ের ছাগল ধরেছিল?

কান্তনাথের মুখে হাসি। শশীর দিকে তাকিয়ে বলল— আরে না, না। মনে আছে, সেই যে সোনারায়ের পুজোর মাগন করতে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম? সেদিন আমাদের কেমন বলেছিল, 'গ্রামে বাঘ বেরোলে কী সোনারায় এসে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমাদের বাঁচাবে?'

কান্ত হুবহু কবরেজের বউয়ের কথা নকল করে শোনালো।

সবাই সমস্বরে বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ। দিয়ছিল দু-মুঠো চাল, কথা শুনিয়েছিল এক হাঁড়ি।

কান্ত— সেদিনই আমি ঠিক করেছি কবরেজের বউকে একটা শিক্ষা দেবো। তাই আজ ফাঁদ পেতে ওর আদরের ছাগলটিকে টোপ হিসেবে বেঁধে দিয়েছিলাম।

গঙ্গা— ছাগলটা আনার সময় তোকে কেউ দেখেনি তো?

শশী— দেখবে কী করে? আমি কি আর চিৎকার করে সবাইকে বলতে বলতে এনেছি। বাড়ির পেছনেই বাঁধা ছিল, ফাঁক বুঝে নিয়ে চলে এলাম।

গঙ্গা— তবে তুই যাই করিস না কেন, তোর মা কিন্তু তোকে খুব বকবে।

কান্ত— মা এসেছিল নাকি?

শশী— আসেনি, তাই বলে কি শোনেনি?

কান্ত— সে মা আমায় একটু বকলে আমি কিছু মনে করি না। ওরকম কত বকে। পরে আবার নিজে নিজেই আদর করে।

গ্রামে ঢুকতেই মায়ের সঙ্গে দেখা। মা অঙ্গনাদেবী উৎকণ্ঠায় থাকতে না পেরে পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাঁর মনে শান্তি ফিরে এলো।

কান্ত দৌড়ে মায়ের কাছে গেল। তারপর মায়ে-পোয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

ছেলেরাও চলে গেল যে যার বাড়ি।

ছয়।।

সূর্য ডুবলেই গোটা জামবাড়ি গ্রাম নিকষ অন্ধকারে ডুবে যায়। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক বন্য নিস্তব্ধতাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। শ্মশানের দিক থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। গভীর বন বাঘের হুংকারে কেঁপে ওঠে। মধ্যরাতে ঘুমন্ত শিশুরা ভয়ে সিঁটিয়ে যায় মায়ের কোলে। গ্রামের মানুষজন দিনের আলো থাকতেই সব কাজ সেরে নেয়। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ বাইরে বেরোয় না। রাতের অন্ধকার পথে তখন যাওয়া-আসা করে অপদেবতারা।

পণ্ডিত দ্বিজপদর বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। চৌকির উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন তিনি। সামনে খোলা একখানি পুঁথি। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রদীপের আলোয় চিন্তাচ্ছন্ন মুখচ্ছবির স্পষ্টতা। দরজায় ধাক্কা পড়ল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন এক বয়স্কা।

— রাত অনেক হলো, এবার ঘুমোতে যাও।

দ্বিজপদর কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি নিশ্চলভাবে বসে থাকলেন। বললে— এতদিনে আমি এক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।

— সম্ভাবনা! কীসের?

— এখানকার এই সহজ-সরল, চেতনাহীন মানুষগুলির একজন অভিভাবকের।

বয়স্কা কিছু না বুঝে নীরব রইলেন।

দ্বিজপদ— তুমি তো দেখছো, এই গ্রামের উপর দিয়ে গৌড় সেনা যায়, অসমের সেনা যায়। তারা লুঠ করে আগুনে ছাই করে দিয়ে যায় সবকিছু। তারপর ভেসে বেড়ায় নারী ও শিশুদের আর্ত কান্না। অথচ এরা কোনোদিন তাদের প্রতিরোধ করে না, নিজেদের বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করে না। কেবল জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়।

একটু থেমে দ্বিজপদ আবার বলেন— তুমি জানো এরা কেন এমন? কারণ, সাহস যোগানোর মতো এদের কেউ নেই।

বয়স্কা— তুমি কার কথা বলছো?

দ্বিজপদ— কান্তনাথ। ওর জন্মকুণ্ডলী আমার তৈরি। আমি ওর কুণ্ডলীতে রাজযোগ দেখেছিলাম। এখন যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছে, তা সত্যি হতে পারে।

বয়স্কা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন— আমরা তো এই বেশ আছি।

দ্বিজপদ— তুমি জানো, এই জামবাড়ির মতো আরও কত জনপদ আছে? তারাও সবসময় ভয়ে ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকে। ভগবান ভরসা ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই তাদের। না অসমের রাজা, না গৌড়ের সুলতান, কেউ তাদের দায়িত্ব নেয় না। অথচ সেনারা এসে বারবার লুঠ করে নিয়ে যায় সর্বস্ব।

বয়স্কা— এখন কী করার কথা ভাবছো?

দ্বিজপদ— বাপ মরার পর মা-ছেলে দুজনে বড় কষ্টে রয়েছে। আমি কান্তকে

নিজের কাছে এনে রাখার কথা ভাবছি। তাহলে গড়েপিটে উপযুক্ত করে নেওয়া যাবে।

বয়স্কা— অভাগী মায়ের কথাও তো ভাবতে হবে!

দ্বিজপদ— সে ভাবনাও আমি ভেবছি।

প্রদীপের তেল শেষ হয়ে এসেছিল। দু-বার দপ্ দপ্ করে জ্বলে নিভে গেল প্রদীপটি। সেদিনের আলোচনায় ইতি।

সাত।।

কিছুদিন হল দ্বিজপদর গোরু-মোষ দেখাশোনার কাজ পেয়েছে কান্তনাথ। কাজ সেরকম কিছু নয়, সকালবেলা গরু-মোষগুলোকে গোয়াল থেকে বের করে মাঠে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। সারাদিন পূবের জঙ্গলের ধার ঘেঁসে চরে বেড়ায়। সন্ধ্যে হলে আবার সেগুলোকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে কারও ফসল না খেয়ে ফেলে।

এই কাজের বিনিময়ে পণ্ডিত দুজনের খোরাকি দেয় ও কিছু পয়সা দেবেন বলেছেন। পণ্ডিত চেয়েছিলেন কান্তনাথ পুরোপুরি তাঁর কাছেই এসে থাক। কিন্তু অতটুকু ছেলেকে একেবারে ছাড়তে অঙ্গনাদেবীর মন সায় দেয়নি। তাই প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা গরু-মোষ ঘরে তুলে দিয়ে কান্ত বাড়ি ফিরে আসে।

কান্তকে এখন সারাদিন মাঠে বা জঙ্গলে থাকতে হয়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও হয় না, আগের মতো খেলাধুলোও হয় না। প্রথম প্রথম মন খারাপ হতো বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে এখন বনজঙ্গলের সঙ্গেই সখ্য গড়ে তুলেছে। গোরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে মাঝে মাঝে সে চলে যায় গভীর জঙ্গলে। ঘন জঙ্গলের রহস্যময় নিস্তব্ধতা আকর্ষণ করে তাকে। আরও গভীর থেকে গভীর বনে হারিয়ে যায়। চিনে নেয় নানান জাতের গাছ, নানা পশু-পাখির ডাক। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়ে কোনো গাছের ছায়ায়।

সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অঙ্গনাদেবী ছেলের জন্য গামছায় বেঁধে দেয় সামান্য খাবার। কোনোদিন চিড়ে, কোনোদিন মুড়ি। কান্তনাথ দুপুরবেলা পরম তৃপ্তিভরে তা খেয়ে নেয়।

রাতেরবেলা পণ্ডিত দ্বিজপদর বাড়িতে বসে মহাভারত পাঠের আসর। দ্বিজপদ

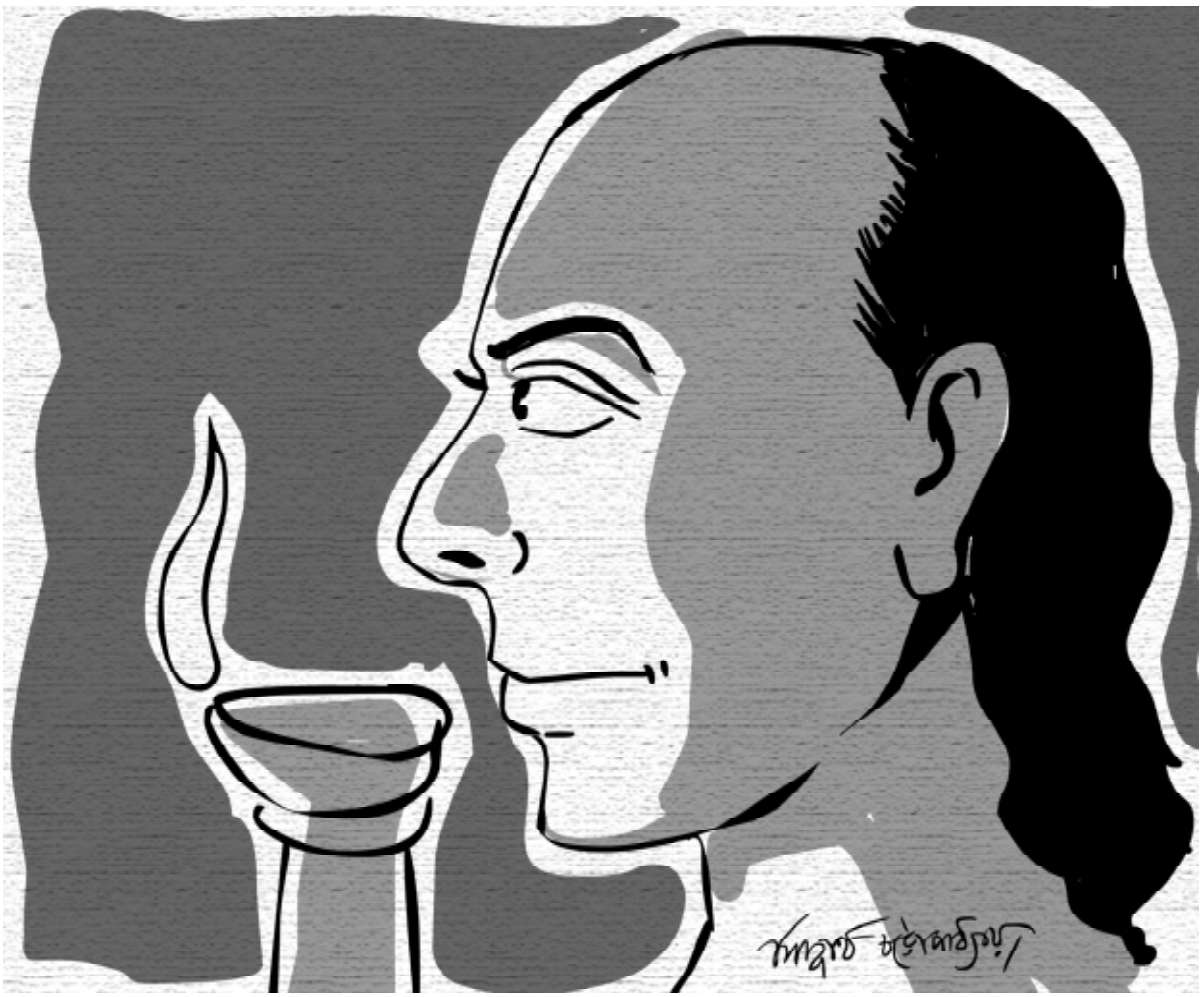

কান্তনাথকে ডেকে নেয় সেই আসরে।

আজকাল তো রামায়ণ-মহাভারত শোনা কান্তনাথের নেশা হয়ে গেছে। যুদ্ধের কাহিনিগুলি তার খুব ভালো লাগে। শুনতে শুনতে কাহিনির মধ্যে হারিয়ে যায় সে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম চরিত্রগুলিকে নিয়ে মনে মনে তৈরি করে কল্পনার জাল। ইচ্ছে করে সেও যদি ওরকম যুদ্ধ করতে পারতো!

আট।।

দুপুরের সূর্য তখন মধ্য আকাশে। গাছের পাতা নড়ছে না। দূরে কোথাও একটি পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে ফটিক জল, ফটিক জল বলে। দ্বিজপদ স্নান-আহ্নিক সেরে খেতে বসবেন। এমন সময় এলো বিশু কবরেজ।

বিশু— ঠাকুর একটি কথা বলতে এলুম। অন্যায় নেবেন না।

দ্বিজপদ— বলো, বলো। কী বলবে।

বিশু— আপনার ওই ছেলেটা, কান্ত। সে রোজ গোরু-মোষগুলো ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় ঘুমায়। আর গোরুগুলো আমার ফসল খেয়ে নেয়। আপনি এর বিহিত করুন। আমার বউ ওই ছোকরাকে অনেকবার বলেছে। ও কোনো কথাই কানে তোলে না।

দ্বিজপদ— আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি যাও, আমি দেখছি।

বিশু কবরেজ দু-হাত বুকের কাছে এনে দ্বিজপদকে প্রণাম করে চলে যায়।

কান্তনাথের এই একরোখা স্বভাবের কথা দ্বিজপদ জানেন। কিন্তু দায়িত্বের প্রতি অবহেলা বা বাড়াবাড়ি রকমের কোনো অন্যায় যে সে করবে না এই বিশ্বাসও আছে।

দ্বিজপদ কাঠালপাতার তৈরি একটা টোকা মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন কান্তনাথের খোঁজে।

কান্তনাথ সাধারণত পুবের জঙ্গলের কাছে গোরুগুলো ছেড়ে দিয়ে আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। দ্বিজপদ সেইদিকেই গেলেন। কিছুদূর গিয়েই চোখে পড়ল গোরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কান্ত কোথায়?

দু-বার হাঁক দিলেন— কান্ত, কান্ত!

কান্তনাথের কোনো সাড়া নেই। ততক্ষণে বেলা পড়ে গেছে। রৌদ্রের তেজ কমতে শুরু করেছে। দ্বিজপদ আরও এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, একটি গাছের তলায় নিদ্রামগ্ন কান্তনাথ। বিশু কবরেজ মিথ্যে বলেনি। গোরু ছেড়ে দিয়ে এভাবে ঘুমোলে গোরু তো অন্যের ফসল নষ্ট করবেই। দ্বিজপদ একটু রুষ্ট হলেন।

পরমুহূর্তেই একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে তির্যকভাবে সূর্যের আলো এসে পড়ছে কান্তনাথের মুখের উপর। সেই আলো আটকে কান্তনাথের মুখ আড়াল করে ফণা তুলে রয়েছে বিশাল একটি সাপ।

স্তম্ভিত হয়ে দ্বিজপদ দাঁড়িয়ে পড়লেন। অস্ফুটে বললেন— রাজলক্ষণ।

নয়।।

কান্ত সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর অঙ্গনাদেবীর অপেক্ষা শুরু হয়, কখন সে ফিরে আসবে। জঙ্গলে কত ভয়। বাঘ, ভালুক বেরিয়ে পড়ে যখন তখন। কান্তনাথের বাঘবন্দি ঘটনার পর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। ছেলে আর না এমন কাজ করে বসে।

— মা, মা। রাস্তা থেকে ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকলো কান্ত।

গামছায় কিছু বাঁধা। এসে মায়ের হাতে তা ধরিয়ে দিল।

— কী আছে এতে?

— পণ্ডিত ঠাকুর বলেছিলেন না দুজনের খোরাকি আর পয়সা দেবেন। আজ ফেরার সময় আমায় ডেকে দুটি পয়সা হাতে দিলেন। গাছে পাকা আম ছিল, মা ঠাকরুণ বললেন, পেড়ে নিয়ে যা। তাই চারটি আমও নিয়ে এলুম।

গামছার বাঁধন খুলে অঙ্গনাদেবী আম চারটি আলাদা করে রাখলেন। পয়সা দুটিকে কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে বললেন— পণ্ডিত ঠাকুর খুব ভালো মানুষ। উনি আমাদের মঙ্গল চান। ওনার কথার কোনোদিন অমান্য করিস না বাবা।

— না, মা। আমি তো ওনার কথা শুনি। সেদিন ওনার কথাতেই তো আমরা বাঘটিকে জালসুদ্ধ নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। নইলে—

— যা, এবার হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি ঠাকুর ঘরে বাতি দিয়ে তোকে খেতে দেই।

মায়ের হাত থেকে গামছাখানি নিয়ে কান্ত হাতমুখ ধুতে গেল।

দশ।।

ভোর হতে বাকি নেই। বাইরে তখনও জমাট অন্ধকার। পাখিরা জাগেনি। নিশাচররা তখনও শিকারের খোঁজে। কান্তনাথের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসলো বিছানায়। একটা স্বপ্ন দেখছিল সে।

অঙ্গনাদেবীর ঘুম খুব পাতলা। কান্ত উঠে বসাতে তাঁরও ঘুম ভেঙে গেল।

— কী হলো! কোনো দুঃস্বপ্ন দেখলি! সারাদিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস, নিশ্চয় কোনো অপদেবতার ছায়া পড়েছে। অঙ্গনাদেবী শিবচণ্ডীর নাম জপতে লাগলেন।

কোনো কথা বলল না কান্তনাথ। সে স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু তা কোনো দুঃস্বপ্ন নয়। অপদেবতার ছায়াও নয়।

স্বপ্নে মায়ের মতো দেখতে এক দেবী এসেছিল তার কাছে। দেবীর সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে সজ্জিত। ঝকমক ঝকমক করছিল চারিদিক। আলোয় আলোয় ভরে গেছে। দেবী এসে বলল— তুই যদি খুব সাহসী হোস তাহলে তার প্রমাণ দিতে কাল দুপুরে নদীর ঘাটে আসিস। একলা। যদি পরীক্ষায় সফল হতে পারিস তাহলে তুই রাজা হওয়ার বর পাবি।

এই বলে দেবী চলে গেলেন।

কান্ত শুনেছে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়।

আবার এও শুনেছে, স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে নেই। তাই সে মায়ের কথার কোনো উত্তর দিল না।

এগারো।।

সকাল থেকে কান্তনাথ আনমনা। রাতের স্বপ্নের কথা ভাবছে। এরকম কী কখনো হয়? সত্যি সত্যি কী কোনো দেবী এসেছিল? পণ্ডিত ঠাকুরের কাছে এরকম অনেক কাহিনি শুনেছে সে। তাহলে পণ্ডিত ঠাকুরকে ঘটনাটি বললে কেমন হয়?

পর মুহূর্তে ভাবে, না, না। বলার দরকার নেই। কথাটি পাঁচকান হলে লোকে হাসাহাসি করতে পারে।

দুপুর হয়ে গেল। গোরুগুলো সব এদিক-সেদিক ছায়ায় বসে আছে। কান্তনাথও একটি গাছের নীচে বসে। স্বপ্নে আসা দেবী তাকে তো এই সময়ই ঘাটে আসতে বলেছে।

কান্ত গামছাটি কষে বাঁধলো কোমরে। তারপর হাঁটা দিল নদীর দিকে।

ঘাটে পৌঁছে দেখে একটি জনপ্রাণীও নেই। স্নানঘাট কখনো এরকম জনশূন্য থাকে না। আজ কেউ স্নান করছে না, কাপড় কাচছে না।

কান্তনাথের মনে আশঙ্কা দেখা দিল। এই জনশূন্য ঘাটে তাহলে সত্যি কোনো পরীক্ষা দিতে হবে তাকে। পরীক্ষা নিতে দেবী কী স্বয়ং আসবেন? আর সবটাই যদি তার মনের ভুল হয়?

অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এর মধ্যে কেউ নদীতে নাইতে এলো না।

কোমরের গামছা খুলে রেখে কান্ত জলে নামল। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে এলে খুব মজা হয়। সাঁতরে নদীর এপার থেকে ওপারে যায়। আবার ফিরে আসে। কখনো ডুব সাঁতার, কখনো চিৎ সাঁতার।

কান্ত একা একা কিছুক্ষণ সাঁতারের পর কোমর জলে দাঁড়ালো। তখনই জলে শুরু হল উথাল-পাতাল। নদীর যে অংশটি খুব গভীর সেখান থেকে কিছু একটা উঠে আসছে।

গ্রীষ্মকালে শান্ত শিঙিমারী নদীর জল কুলকুল করে বয়ে যায়। এখন সেই জলরাশিতে ঢেউ লাগছে। যা উঠে আসছে সেটি আকারে বিশাল। নিশ্চয় কোনো জলচর প্রাণী! কিন্তু এই নদীতে এরকম কোনো প্রাণী আছে বলে কান্ত শোনেনি।

কান্ত তখনও কোমর জলে দাঁড়িয়ে। জন্তুটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এরপর কান্ত যা দেখল, তাতে সে শিউরে উঠল।

দানব আকারের একটি কুমির।

কুমিরটি রাক্ষসের মতো হাঁ করে তার দিকে ধেয়ে আসছে। বড় বড় চোখ দুটিতে হিংস্রতা। কুমিরের গল্প কান্ত শুনেছে, কখনো দেখেনি।

কুমিরটি যত এগিয়ে আসছে, কান্ত এক পা দু-পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

পিছোতে পিছোতে কান্ত একসময় ডাঙ্গায় উঠে গেল। কুমিরটিও কাছাকাছি এসে থেমে গেল। তারপর জলের উপর একটা বড় ঝাপটা দিয়ে তলিয়ে গেল।

কান্ত এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল। পরক্ষণেই তার সম্বিত ফিরে এলো। তাহলে দেবী তাকে বাঘের মতো এই কুমিরকেও বন্দি করার ইঙ্গিত দিয়েছে?

কিন্তু কুমির তো নেই। ডাঙায় দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল আবার জলে নামবে কী না। বুক দুরু দুরু করছে। কুমির যদি আবার ভেসে ওঠে, তাহলে কী করবে?

জলে নামলো কান্ত। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। নাহ্, কুমির নেই।

পরমুহূর্তেই ওর বুক ছমছম করে উঠল। দূরে আবার কিছু এটা ভেসে উঠছে। কালো মাথা, পিঠ দেখা যাচ্ছে।

মাছ?

এতো বড়!

মাছটি একবার জলের উপরে মাথা তুলল। চোখ দুটি রক্তের মতো লাল। মাছটির লেজের ঝাপটায় পাড়ে জলের ধাক্কা লাগছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে মাছটি। কান্ত এবারও পিছিয়ে গেল। বুঝতে পারছে না কী করবে। এ মাছ কুমিরের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়।

কান্ত ধরতে পারলো না। মাছটি জলে তলিয়ে গেল।

দেবী তার কীরকম পরীক্ষা নিচ্ছে? কান্ত এবার মন শক্ত করল। কিছুক্ষণ বাদে আবার নামলো জলে।

এবার ওপার থেকে এঁকেবেঁকে আসছে একটি সাপ। জলে জঙ্গলে কান্ত অনেক সাপ দেখেছে। অনেক সাপ ধরেছে। মনে মনে পণ করল, সাপটিকে ধরবেই।

সাপটির দিকে তেড়ে গেল কান্ত।

লেজটি ধরতেই সাপটি জলের উপরেই যেন ফণা তুলে দাঁড়ালো। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে লাগলো তাকে। কান্ত চেষ্টা করছে সাপটিকে ডাঙায় নিয়ে আসার। কিন্তু সাপটির এত শক্তি যে কান্ত কিছুতেই পেরে উঠছে না। ক্রমশ গভীর জলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

একসময় সাপটিকে ছেড়ে দিল সে। উঠে এলো ডাঙায়।

বারো।।

দুপুরের ঘটনার কথা কান্ত কাউকে জানায়নি। নদীতে স্নান করে আবার সে ফিরে গেছে পূবের জঙ্গলের ধারে। প্রতিদিনের মতো গোরুর পালকে ঘরে তুলে বাড়ি ফিরে এসেছে।

তখন মধ্যরাত। সেদিনও তার ঘুম ভেঙে গেল। গতরাতের স্বপ্নে দেখা দেবীকে সে আবার দেখলো।

দেবী হাসছিল আর বলছিল— তোর না খুব সাহস? আমাকে দেখে অমন ভয় পেয়ে গেলি? তবু শেষবার আমায় ধরেছিস, তাই তোকে আমি এক পুরুষ রাজা হওয়ার বর দিলাম।

দেবী চলে যেতেই কান্ত জেগে উঠলো।

আজ মায়ের ঘুম ভাঙেনি। কান্ত দরজা খুলে বাইলে এলো। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে কোথাও একটা পেঁচা কর্কশ স্বরে ডাকছে। সে পা চালালো পণ্ডিত দ্বিজপদর বাড়ির দিকে।

দ্বিজপদর বাইরের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

দরজায় ধাক্কা পড়ল।

— এসো ভিতরে এসো।

কান্ত দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। দ্বিজপদ যেন তার জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। এত রাতে কান্তকে দেখে তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না। অবাক হলেন না।

কান্তকে বসার ইঙ্গিত করে বললেন— গৌড়ের সুলতান অসম রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছে। তারা এখন করতোয়া নদীর পাড় ধরে এগিয়ে আসছে। এই পথেই তারা অসম যাবে। আবার এখানকার কত মানুষের সর্বনাশ হবে। কত গ্রাম লুঠ হবে, আগুন জ্বলবে।

আর নয়। এবার প্রতিরোধ করতে হবে।

কী বলছেন পণ্ডিত ঠাকুর! এ স্বপ্ন নয় তো? কান্ত নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল দ্বিজপদর দিকে।

দ্বিজপদ বললেন, — এখন তোমায় বেশি কিছু করতে হবে না। গ্রামের মানুষ তোমার শক্তি ও সাহসের কথা জানে। তোমায় সমীহ করে। তুমি কিছু বললে ওরা শুনবে, তোমার কথা মানবে। সর্দারের মতো তাদের তুমি এক জায়গায় নিয়ে এসো। বাকি পরিকল্পনা আমি করছি।

কান্তনাথের শরীর কাঁপছে। শরীরে রক্তের গতি যেন বেড়ে গেছে।

স্বপ্নের কথা পণ্ডিতের কাছে সে ব্যক্ত করল না।

সব কিছু তার বিস্ময়কর লাগছে।

দেবী তাকে সত্যিই রাজা হওয়ার বরদান দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে নব্য যুবা কান্তনাথ কামতাপুর নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কান্তেশ্বর নাম নিয়ে রাজা হয়েছিল সে। তার রাজ্যের সীমা ছিল পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত। কোচবিহার জেলার গোসানিমারীতে গেলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়
রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, যা কান্তেশ্বরের রাজপাট নামে পরিচিত।

কাহিনি সূত্র গোসানীমঙ্গল,
রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী।

শব্দরূপ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

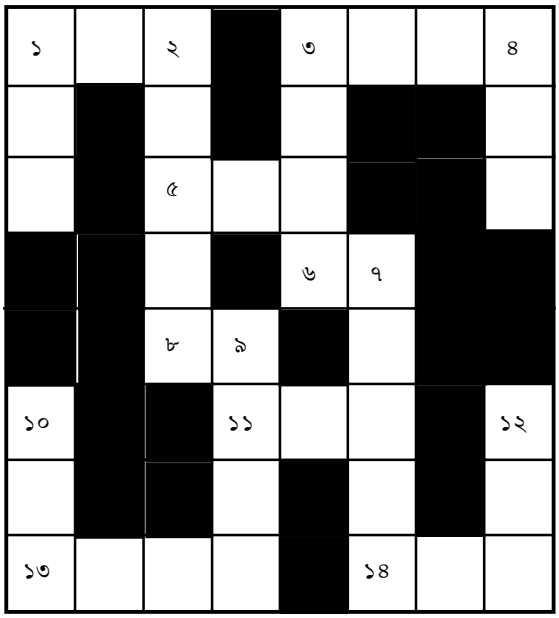

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. 'সত্যম — সুন্দরম', **৩.** দুর্গাপূজার অষ্টমীতিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমীতিথির প্রথম ২৪ মিনিট, মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডারূপে পূজা (তান্ত্রিকমতে), **৫.** 'মেরেছ — -র কানা / তা বলে কি প্রেম দেব না', **৬.** 'মায়ের পায়ের — হয়ে ওঠ না ফুটে মন', **৮.** নির্মাতা, শিল্পী ('কুম্ভ — '), **১১.** বেগুন, **১৩.** করায়ত্ত, অধিকৃত, **১৪.** রমাপতি, বিষ্ণু।

উপর-নীচ : ১. শিবপত্নী, দুর্গা, **২.** কাশীর শ্মশানঘাট, **৩.** সরোজ, পদ্ম, **৪.** জুহুকন্যা, গঙ্গা, **৭.** আকাশবাণীতে 'মহিষাসুরমর্দিনী'-অনুষ্ঠানটির গান রচনা করেছিলেন ইনি, **৯.** অনিমন্ত্রিত আগন্তুক, **১০.** দেবী দুর্গার বাহন, **১২.** উমাপতি, শিব।

অঙ্কের ধাঁধাঁ

শৌনক রায়চৌধুরী

১। নিচের ছকে মোট ৮টা খোপ আছে। এই খোপগুলিতে ১ থেকে ৮ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি এমন ভাবে বসাও যাতে কোনো সংখ্যা তার আগের বা পরের সংখ্যায় সংলগ্ন খোপে না থাকে। এখানে দুটো খোপ পাশাপাশি, উপর-নীচ বা কোণাকুণি থাকলেই তা সংলগ্ন খোপ ধরা হবে।

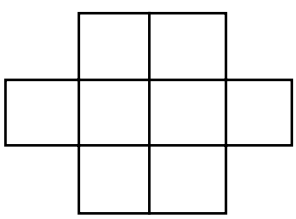

২। দুটো আট ও দুটো তিন দিয়ে ২৪ বানাও। শুধু, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং বন্ধনী ব্যবহার করতে পারবে।

৩। একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা লেখ যার বাঁদিক থেকে প্রথম অঙ্কটি হলো সংখ্যাটিতে থাকা শূন্যের সংখ্যা, দ্বিতীয় অঙ্কটি হলো সংখ্যাটিতে থাকা ১-এর সংখ্যা। এই ভাবে বাঁদিক থেকে দশম অঙ্কটি হলো ওই সংখ্যাটিতে থাকা ৯-এর সংখ্যা। সংখ্যাটি আসলে কতো?

৪। শুধু চারটে ৪ ব্যবহার করে ৫, ৬, ৭ ও ৮ বানাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বন্ধনী, দশমিক বিন্দু ও বর্গ ব্যবহার করে।

উত্তর

১।

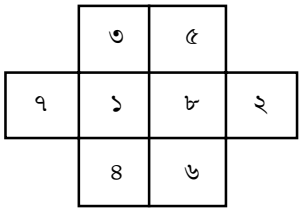

২। $৮/(৩-(৮/৩))$
$= ৮/(১/৩)$
$= ২৪$

৩। সংখ্যাটি হল ৬২১০০০১০০০।

৪। $৫ = (৪ \times ৪ + ৪) / ৪$
$৬ = ৪ \times ·৪ + ৪·৪$
$৭ = (৪৪/৪) - ৪$
$৮ = ৪ + ৪·৪ - ·৪$

With Best Compliments from -

R K Global

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :

SAHARA Electrical Appliances

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

A little precaution.

Safe journey to your destination.

Your co-operation with us will ensure absolute safety

- Never cross the Yellow Line on the platform when there is no train.
- Do not carry any inflammable article on trains and at railway premises.
- Please inform station staff or security staff in case you notice any unattended object at platform, on trains and track.
- Allow passengers to detrain first and then entrain.
- Do not entrain forcibly. Once the door closes, step back and wait for the next train. Avoid over-crowding.

As per sections 67, 164 and 165 of the Railways Act, 1989, carriage of dangerous or offensive goods on a Railway Compartment is a punishable offence.

Metro Railway, ***Kolkata***

Kolkata's Pride

Follow us on: /metrorailkolkata | /metrorailwaykol

Your safety - our concern

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০
(২য় খণ্ড) ₹ ৩৫০

দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০

ড. সিলিনা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০

প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিত্রা চৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০

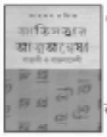

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা
বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০

Dr. Subhrendu Bhattacharya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০

বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০

সাতটি রহস্য উপন্যাস
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০

সিদ্ধার্থ সিংহ
নামগোত্রহীন
₹ ৩৫০

সুকুল গুহ
খর্সাং পাহাড়ের রহস্যটিলা
₹ ২৭৫

Anjusri Chandra
Roaming from Place to Place Country to Country
₹ ২০০

প্রিটোনিয়া

১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ • ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে
আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

NR Vandana R

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386